দুরূদ কি ও কেন ?
দুরূদ পাঠের হাদীস ভিত্তিক পদ্ধতি
মূল
ইমাম ইব্‌নে কাইউম জাওযীয়াহ (রঃ)
অনুবাদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল আযীয

দুরূদ কি ও কেন?
দুরূদ পাঠের হাদীস ভিত্তিক পদ্ধতি

ইমাম ইব্‌নে কাইউম জাওযীয়াহ্‌ (রঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল আযীয
লেকচারার, মানারাত ঢাকা আন্তর্জাতিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
এম. এম, বি. এ (অনার্স), এম. এ (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
ডিপ্‌-ইন্‌-ইউ, পাকিস্তান

প্রকাশনায়

আর আই এস পাবলিকেশন, ঢাকা

দুরূদ কি ও কেন?

দুরূদ পাঠের হাদীস ভিত্তিক পদ্ধতি

মূল ঃ ইমাম ইব্‌নে কাইউম জাওযীয়াহ (রঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুল আযীয

প্রকাশক

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

আর আই এস পাবলিকেশন্স

বাইমাইল, কোণাবাড়ী, গাজীপুর

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ এবং কম্পোজ

রহমত কম্‌পিউটার্স

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৭-৪৪৫৭০২

মুদ্রণে

আল-মানার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

৩৭, আর এম দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনা

কাঁটাবন বুক কর্নার

কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২

অনুবাদকের আরজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَمَنِ اتَّبَعَهٗ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ *

ইসলামের প্রতিটি বিধান অমোঘ, শাশ্বত, যুগোপযোগী। যদিও আজকের মুসলিম জাতির হীনমন্যতা ও অধঃপতনের কারণে একথা বলা অলীক ও কল্পনাবিলাস মনে হয়। আসলে এটিই সত্য ও প্রতিষ্ঠিত। বিধানগুলো এতো সার্বজনীন যে, শত-সহস্র বছর আগে এগুলো যেমন প্রযোজ্য ছিল আজকের অত্যাধুনিক যুগ কিংবা সৃষ্টির লয় পর্যন্ত এ বিধানগুলো সমভাবে গ্রহণীয় ও প্রযোজ্য।

যেসব আদর্শ ও নীতি সমাজ, দেশ ও জাতিকে অনাবিল শান্তি দিতে পারে, সেসব নীতিই সংবিধানে রূপান্তরিত হয়। এসব আদর্শ ও নীতির উদ্ভাবক ও ধারক-বাহকগণই মহামানবরূপে স্বীকৃত। মহামানবদের প্রণীত নীতি গ্রহণ করা, তাদেরকে অনুসরণ করা দেশ ও সমাজের জন্যে কল্যাণকর বৈকি।

একথা নতুন করে বলার দরকার নেই যে, আমাদের নবী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। শ্রেষ্ঠত্ব ও সকলের স্মরণীয় হওয়ার জন্যে যেসব স্বীকৃত গুণাবলী ও স্বাতন্ত্র্যের দরকার, তিনি সেসব বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বনন্দিত এ মহামানব তথা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুসলিম জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি।

মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন, "আমার (আল্লাহ) মহব্বত, মাগফিরাত ও রহমত কামনা করলে আমার নবীকে অনুসরণ করতে হবে।" তিনি আরো বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর সালাত পেশ করেন। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ কর।"

মহানবীকে তাঁর উম্মত কিভাবে অনুসরণ-অনুকরণ করবে, কোন পদ্ধতিতে তাঁর উপর 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ করবে, তা তিনি বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।

কুরআনের নির্দেশ এবং রাসূলের আদেশানুযায়ী 'সালাত' বা 'দুরুদ' পাঠ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে অপরিহার্য। এ কাজটির মর্যাদা, ফজিলত খুবই উচ্চসিত। অপরদিকে, কাজটি পরিত্যক্ত হলে এর পরিণামও ভয়াবহ। মর্যাদা লাভের আশায় এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'দুরূদ' পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সালাম' পেশ করার পদ্ধতি তো জানি। কিন্তু 'সালাত' পেশ করার প্রক্রিয়া কি? জবাবে তিনি বলেছেন, নামাযে তাশাহুদের পর তোমরা যেভাবে দুরুদ পাঠ কর, সেভাবেই আমার উপর 'সালাত' পাঠ কর। রাসূলের উপর 'দুরুদ' পাঠ করার পদ্ধতি সম্পর্কিত এ হাদীসটি অন্ততঃ ৪১ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। সুতরাং রাসূলের উদ্দেশ্যে 'সালাত' বা 'দুরুদ' পেশ করার এ পদ্ধতিই সঠিক ও বিশুদ্ধ। অন্যকোনো প্রক্রিয়ায় 'দুরুদ' পেশ করা হাদীস ও স্বীকৃত পদ্ধতির খেলাপ যা কোনো অবস্থাতেই মানা যায় না।

পাক, ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশে রাসূলের উপর 'দুরুদ' বা 'সালাত' পাঠ করার এক অভিনব ও মনগড়া পদ্ধতি চালু আছে। এ পদ্ধতি মিলাদ শরীফ, এগার শরিফ, মিলাদুন্নবী, ইশকুন্নবী, যশন, জুলুস ইত্যাকার নামে পরিচিত। 'মিলাদ' নামে অভিহিত এ ধরনের মনগড়া 'দুরুদ' পড়ার পদ্ধতি আমাদের মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত, অত্যন্ত জনপ্রিয়। অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও নিবেদনসহ মিলাদের আয়োজন করা হয়। এ দেশে এমন লোক কিংবা ঘর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যে ঘরে মিলাদের আয়োজন হয় না। প্রাসাদবাসী থেকে কুটিরবাসী সকলের কাছে মিলাদের আবেদন সমান। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনায়, ঘর-দরজা-ইমারত নির্মাণে, গাছ তরু-লতা, ফল-ফলাদির উৎপাদনে, রোগ-ব্যাধির, বালা-মুছিবত থেকে নিষ্কৃতি লাভের অভিপ্রায়ে এমনকি সিনেমা, বার, রেস্তোরাঁ, ক্লাব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে, ছায়াছবির মুক্তি দিবসে এ ধরনের মিলাদের আয়োজন করা হয়। কারো মৃত্যুবার্ষিকী তো এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। সরকারী পর্যায়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয় অত্যন্ত সাড়াম্বরে। টেলিভিশন, বেতার কেন্দ্র থেকে এরূপ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে যা রাষ্ট্রীয়

পর্যায়ে হাজার ভোল্টের বাল্বের উজ্জ্বল আলোতেও মিলাদ মজলিশের দরবারে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বলতে থাকে। যেনো অগ্নি পূজার মহড়া। আরো আশ্চর্য ব্যাপার হলো 'মিলাদ' নামের এরূপ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন এ দেশেরই আলেম, পীর-মাশায়েখগণ। এ নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বাহাস, দ্বন্দ্ব, এমনকি মারামারির ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। মিলাদ অনুষ্ঠানে একটি পর্ব আছে, যেখানে উপস্থিত সবাইকে দাঁড়াতে হয়। এ দাঁড়ানোকে তাদের পরিভাষায় 'কিয়াম' বলা হয়। 'কিয়াম' করার যৌক্তিকতায় তারা বলে থাকেন, নবীকে 'ইয়া নবী' বলে সম্বোধন করলে নবী মোস্তফা সে মজলিশে হাজির হন। আর নবীর আগমনকে স্বাগতম জানানোর জন্যেই দরকার হয় 'কিয়াম' এর।

'মিলাদ' নামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীর উপর 'দুরুদ' পড়ার মনগড়া পদ্ধতি কখন, কোথায় এবং কে উৎপত্তি করেন তার সঠিক ইতিহাস অজানা। তবে একথা সত্য যে, প্রসঙ্গটি তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার একটি ছাপ। সূফীবাদে ফানা ফিশ্ শেখ, ফানা ফির রাসূল, ফানা ফিল্লাহ-বাকাবিল্লাহ নামে একটি স্তর আছে। এ স্তরে সালেককে স্বীয় পীর কেবলার চেহারা (তাসাব্বুরে শায়খ) ধ্যান করতে হয়। পীর কেবলার ধ্যানের মাধ্যমে ধরা দেন নবী। এভাবেই একজন সালেক আল্লাহর সাথে নীল হয়ে যায়। মিলাদে 'ইয়ানবী' বলে তারা নবীকে হাজির করান। এরূপ ধ্যান ধরা কিংবা এ ধরনের কোনো পদ্ধতির অনুশীলন করা কুরআন হাদীস সমর্থিত নয়।

রাসূল পরবর্তী সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ সালফেসালেহীন প্রমুখদের আমলে কিয়াস কিংবা ইজমার রেশ ধরে এরূপ অনুশীলনের কোথাও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এর সাথে ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের সহায়তা রয়েছে বলে অনুমিত হয়। কেননা চক্রান্তকারীরা এতোই সূক্ষ্ম ও কুটিল যে তাদের চক্রান্ত ধরা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ইসলামের শাশ্বত বিধানে বিকৃতি ঘটাতে সক্ষম হলে সেটাই তো সফলতা। রাসূলের উপর দুরুদ পাঠের যে পদ্ধতি স্বয়ং রাসূল শিক্ষা দিলেন তা ভুলে গিয়ে বিকৃত পদ্ধতিতে সওয়াব ও আল্লাহ তুষ্টির আশায় তা সাড়ম্বরে পালন করা চক্রান্তকারীদের সফলতার স্বাক্ষর নয় কি?

কুরআনে আছে, সর্বযুগে সমকালীন অপশক্তি তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যেতো হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে কিংবা তাদের ধারণায় দায়িত্ব কর্তব্য পালনার্থে অথবা সৎকর্ম জ্ঞানে। বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজেও এরূপ বেশ কিছু অপকর্ম ও তৎপরতার রেওয়াজ আছে, যেগুলোকে তারা সওয়াবের

বুকভরা আশা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। মাজারে মানত করা, মিলাদ নামের অনুষ্ঠান করা ও উরুশ করা, মাজার কেন্দ্রিক মেলা করা এ ধরনের গর্হিত কাজ।

৭ম হিজরী শতাব্দীর নন্দিত দার্শনিক আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রঃ)-এর রচিত اَلْمُنْتَقٰى مِنْ جَلَاءِ الْاِفْهَامِ فِيْ فَضْلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ গ্রন্থটি একটি যুগান্তকারী কিতাব। বর্তমান শতকের জন্য গ্রন্থটি খুবই যুগোপযোগী। হাদীসে বর্ণিত দুরুদের শব্দ ও বাক্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। দুরুদ কেন পড়তে হবে এবং কোথায় পড়তে হবে, পড়লে তার প্রতিদান কি এবং না পড়লে তার পরিণতি কি হবে, এসব কথাও তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। গ্রন্থটির সবচে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো, রাসূলের উপর 'সালাত' বা 'দুরুদ' পড়ার পদ্ধতি বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আলোকপাত করেছেন যা বর্তমান সময়ের জন্যে খুবই উপযোগী।

যুগ যুগ নয় শত শত বছরব্যাপী যে প্রথার প্রচলন থাকে, তা সমাজদেহে সংক্রমিত হয়ে শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের প্রথা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়। এরূপ সংক্রমিত ব্যাধি দূর করা খুবই কষ্টকরও সময় সাপেক্ষ। মনগড়া দুরুদ পাঠ পদ্ধতি একটি সংক্রমিত ব্যাধি সাদৃশ। ইমাম ইবনে কাইয়িমের রচিত গ্রন্থখানি এ ব্যাধির একটি মোক্ষম ব্যবস্থাপত্র মনে করে আমি বইটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি। ইতোমধ্যে কিছুটা সংযোজনসহ কয়েকটি ভাষায় গ্রন্থটির সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রকাশনা গ্রন্থটিকে নূতন সাজে সংকলন করে বিশ্বের মুসলমানদের কাছে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

গ্রন্থটির হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি, বরং মৌলিকভাব ও তত্ত্ব বজায় রেখে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভুল হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। শ্রদ্ধেয় পাঠকগণ ভুল সংশোধনে সহায়তা করলে কৃতজ্ঞ হবো। গ্রন্থটি ভ্রান্ত আকীদা ও ত্রুটিপূর্ণ পন্থা পরিহার করতে সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

১০ই জিলহজ্ব, ১৪২২ হিঃ
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ ইং

মুহাম্মদ আবদুল আযীয
এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০১

সূচিপত্র

কেনো রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করতে হবে

একজন সচেতন লোকের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে বর্বরতার চরম সন্ধিক্ষণে জন্ম গ্রহণকারী 'মুহাম্মদ' নামধারী একজন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও বিনয়ী হওয়ার রহস্য কি? লোকটিকে চরম ও পরমভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে না পারলে সত্যিকার মানুষ না হওয়ারই বা কারণ কি?

আল্লামা মাওয়ারদি (রঃ)-এ ধরনের সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, একজন ব্যক্তি যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সকলের কাছে পূজনীয়, শ্রদ্ধেয়, বরণীয় ও গ্রহনীয় হয়ে থাকে, সে সব গুণাবলী ঐ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

তিনি বলেছেন, পরিপূর্ণ ও সত্যিকার মানুষ রূপে গণ্য হওয়ার উপাদান হলো চারটি। ১. সৃষ্টির পূর্ণতা (كَمَالُ الْخَلْقِ) ২. চরিত্রের পূর্ণতা (كَمَالُ الْأَخْلَاقِ) ৩. কথার মর্যাদা (فَضَائِلُ الْاَقْوَالِ) ৪. কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া (فَضَائِلُ الْاَعْمَالِ)।

প্রথম উপাদান ঃ (كَمَالُ الْخَلْقِ) সৃষ্টির পূর্ণতা ঃ

সৃষ্টির ব্যাপারে চারটি বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটলে সে সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে।

১ম বৈশিষ্ট্য ঃ চেহারায় থাকবে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় এবং প্রশান্তিমূলক উদ্দীপনা। আমাদের পেয়ারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারায় ছিল শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়-ভীতি। ইতিহাস সাক্ষী, আমাদের নবীর চেহারা দর্শনে ইরানের সম্রাট কায়সারের প্রতিনিধির অন্তরাত্মা সেদিন কেপেঁ উঠেছিল। আপনজন তো বটেই এমনকি প্রতিপক্ষগণের চোখেও তিনি ছিলেন মহান এক ভয়ংকর। এই ভয় ও শ্রদ্ধার মধ্যে ছিলনা কোনো ধরনের কৃত্রিমতা বরং ছিল নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতা।

২য় বৈশিষ্ট্য ঃ অবয়বে থাকবে আলিঙ্গন ও ভালোবাসা পাওয়ার পরশ ও আন্তরিকতা। নবী আলাইহিস সালামের জীবন প্রবাহে এমন অনেক ঘটনা

রয়েছে যেখানে তাঁকে দর্শন করা মাত্র দর্শক তার প্রতি বিমোহিত হয়ে পড়ে। ঔরশজাত সন্তান, জন্মদাতা পিতা-মাতা, আপন ভাই, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাকার সম্পর্কিত লোকজনের চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে ভালোবাসার হাজার হাজার নজীর একথার প্রমাণ।

৩য় বৈশিষ্ট্য ঃ চেহারায় থাকবে গ্রহণযোগ্যতার আকর্ষণ। আকর্ষণটি হবে এমন প্রবল ও মর্মস্পর্শী যে তাকে গ্রহণ করা এবং তাঁর সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টি করা এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে মনের মধ্যে একটি ব্যস্ততা ও ত্রস্ততা দেখা দিবে। এরূপ আকর্ষণীয় অংগ সৌষ্টবের অধিকারী ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর অংগ সৌষ্টব দর্শনে যে তাঁর সাথে একবার সাক্ষাত করেছে সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত করেছে। তবে যারা প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে দুশমনী করেছে, তাদের কথা আলাদা।

৪র্থ বৈশিষ্ট্য ঃ আকার-আকৃতি এমন কোমল, মসৃণ, লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হবে যে, তাকে বার বার দেখার ইচ্ছা হয়, তাকে নেতা বানাতে মন চায়, তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে চলতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করা হয়।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ অবধি কোটি কোটি লোক যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং যারা তাঁর গুণ-গান শুনে বিমোহিত হয়েছেন তারা সকলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের মূর্ত সাক্ষী।

দ্বিতীয় উপাদান ঃ চরিত্রের পূর্ণতা (كَمَالُ الْاَخْلَاقِ) ঃ

চরিত্রের পূর্ণতার জন্যে ছয়টি গুণের সমাহার ঘটা বাঞ্ছনীয়।

১ম গুণ ঃ বুদ্ধির প্রাধান্যতা, মতামতের বিশুদ্ধতা এবং দূরদর্শীতায় সততা থাকা। এ গুণগুলো কারো চরিত্রে থাকলে তার কর্মতৎপরতা, কলা-কৌশল এবং মতামত বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় হয়ে থাকে। এরূপ গুণের অধিকারী লোক কাউকে কখনো প্রতারণা দেয় না। সে নিজেও প্রতারিত হয় না। তিনি সব ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতঃ স্বীয় অবস্থায় অবিচল ও অটল থাকতে সক্ষম।

২য় গুণ ঃ যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করতে সক্ষম হওয়া। যে কোনো ধরনের বালা মুসিবত ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধা-বিপত্তি আপন চরিত্র মাধুর্যে

মুকাবিলা করতঃ কামিয়াবী হওয়ার ভুরি ভুরি নজির নবীদের জীবন প্রবাহে কালের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৩য় গুণ ঃ পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্ত হওয়া এবং স্বল্পে তুষ্ট থাকা। নবীজির চরিত্রে এসব গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল অত্যন্ত পরিপূর্ণভাবে। স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাসক্তির যে বিরল উদাহরণ তিনি স্থাপন করেছেন তা ছিল অতুলনীয়। বিশ্ব নন্দিত এই লোকটির মৃত্যুর পর তাঁর গৃহে এক বেলার খাবার খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবার পরিজনদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। দু'বেলার খাবার একত্রিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে এক বেলার খাবার অকাতরে হৃষ্টচিত্তে বিলিয়ে দিতেন। বিত্তশালী লোকদেরকে পরোপকার্থে বিলিয়ে দিতে উৎসাহিত করতেন। সম্পদ জমা বা গুদামজাত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

৪র্থ গুণ ঃ চরিত্রে থাকবে মানুষের জন্যে সদয় হওয়া, পরের উপকারে অনুকম্পার হাত প্রসারিত করা এবং বিনয় ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হওয়া।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব গুণাবলীরও মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বস্তুতঃ যে মুহূর্তে এসব গুণাবলী গুণ বা বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হতো না বরং হতো হীনমন্যতা ও অসম্মানের উপাদন রূপে, সে মুহূর্তে তিনি তাঁর চরিত্র মাধুর্যে এগুলোকে প্রকৃত গৌরব ও সম্মানের উপাদানরূপে পরিগণিত করতে সক্ষম হোন। বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, আতরাফ-আশরাফ সব শ্রেণীর লোকের সাথে অবাধে চলা-ফেরা, উঠা-বসা করে বিনয় ও নম্রতার উদাহরণ স্থাপন করেন।

৫ম গুণ ঃ বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা ও দূরদর্শীতার ছাপ থাকবে চরিত্র ও আচরণে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও আচরণে এসব গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণভাবে। তৎকালিন শত্রু পক্ষের শাসক প্রশাসকের শত অত্যাচার ও অবিচারের মুকাবিলায় তিনি যে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন তা ছিল নজিরবিহীন। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত কলহ বিদ্রোহ ও ঝগড়া ফ্যাসাদের ব্যাপারে তিনি যে ফয়সালা দিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শীতার মূর্ত প্রতীক।

মক্কা বিজয়ের দিন নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পরম ও চরম শত্রুকে তিনি আপন করে নেন। যে নারী চাচা আমির হামযাকে (রাঃ) শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং জিদ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল, তাঁকে হাতের নাগালে পেয়েও তিনি আল্লাহর বাণী ঘোষণা করলেন।

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানদের চেয়ে অধিক মেহেরবান।"

(ইউসুফ ঃ ৯২)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন প্রবাহে কঠোরতার যে দু'একটি ঘটনা আছে তা ছিল স্থান-কাল পাত্রভেদে এবং মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশে।

৬ষ্ঠ গুণ ঃ ওয়াদা খেলাফ না করা এবং প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উন্নত চরিত্রের অন্যতম উপাদান। এ মৌলিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন আমাদের নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নবীর গোটা জীবনের সুদীর্ঘ সময়ে ওয়াদা খেলাফের একটি সামান্যতম উদাহরণও কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। বরং তিনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন অক্ষরে অক্ষরে, জীবন দিয়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তিনি যে শর্ত ও ওয়াদা করেছিলেন সেসব শর্তাবলী আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো তিনি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছেন। তিনি ওয়াদা রক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি। বরং ওয়াদা রক্ষা করা, প্রতিশ্রুতি পালন করা এবং কোনো অবস্থাতেই ওয়াদার খেলাফ না করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়াদা রক্ষা করলে প্রতিদানে কি সুফল হবে এবং ওয়াদার খেলাফ করলে পরিণতি কত করুণ ও হৃদয় বিদারক হবে এসব কথারও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরোক্ত ছয়টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য রাসূলের চরিত্র ও আচরণে ষোলকলায় পূর্ণ ছিল। অধিকন্তু তিনি ছিলেন এসব গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর আদর্শ ও মডেল।

তৃতীয় উপাদান- বাচনভংগীর কুশলতা (فَضَائِلُ الْاَقْوَالِ) ঃ

বাচনভংগীর কুশলতা আটটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

১ম বৈশিষ্ট্য ঃ কথায় থাকবে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা।

একথা সর্বজন বিদিত যে, আমাদের প্রিয় নবী ছিলেন উম্মি, নিরক্ষর। আক্ষরিক অর্থে লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ. ভাষাবিদ। তিনি কোথাও লেখা-পড়া করেননি, কোনো শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেননি। কোনো পাঠ পড়েননি। তাঁর ছিল না কোনো উস্তাদ। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন ভাষার পণ্ডিত। তাঁর কথা ও বর্ণনায় ছিল আভিজাত্য ও শালীনতার ছাপ।

২য় বৈশিষ্ট্য ঃ শ্রুত কথা কিংবা বর্ণিত বিবরণ সংরক্ষণে সক্ষম হওয়া। এ বৈশিষ্ট্যও ছিল আমাদের নবীর কথায় ও বর্ণনায়। আসলে আল্লাহ্ যাকে স্বীয় মনোনীত ও মনঃপুতরূপে সৃষ্টি করেন তাঁর বৈশিষ্ট্যের তুলনা হয় না। তাঁর মুখ নিঃসৃত হাজার হাজার বছরের আগের নবী-রাসূলগণের সুদীর্ঘ ইতিহাস, লক্ষ বছর আগে সংঘটিত ঘটনা শুনে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। তাঁর মেধার তীক্ষ্মতা, মনের উদারতা ও অন্তকরণের বিশালতা কথায় ফুটে উঠতো।

৩য় বৈশিষ্ট্য ঃ কথায় থাকবে ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা ঃ রাসূলের কথায় ছিল ব্যাপকতা। তাঁর বলা কথা ছিল বাক্যের আকারে। কিন্তু অর্থ ও তাৎপর্য ছিল ব্যাপক ও সার্বজনীন। তাঁর অনুসৃত বাণীতে একথার প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেন اُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ অর্থাৎ "ব্যাপক অর্থবোধক কথামালার অধিকারী হয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।"

৪র্থ বৈশিষ্ট্য ঃ কথায় থাকবে আবেশ-আবেগ, আকর্ষণ ঃ আমাদের নবীর কথায় এ বৈশিষ্টগুলো ছিল পরিপূর্ণভাবে। তিনি কথা বললে রাগ করতেন না। তাঁর কথায় ছিল মমতা ও স্নেহ। এতীম, মিসকীন, বিধবা, অসহায় লোকজন তাঁর দয়াদ্র কথায় বিগলিত হয়ে যেতো। আর গুণীজনেরা হতেন আশ্চর্য।

৫ম বৈশিষ্ট্য ঃ প্রশ্নবোধক কথায় থাকবে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন উত্তর বা সমাধান। এ বিষয়েও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ প্রতীক। কেউ প্রশ্ন করলে তার

জবাব দিতেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে। উত্তর দানে কোনো জড়তা, আড়ষ্টতা কিংবা জটিলতার লেশ মাত্র থাকত না।

৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ঃ কথায় অতিরঞ্জন, প্রতারণা, তিক্ত কথা ও হঠকারিতা না থাকা। রাসূলের কথায় কেউ বিন্দুমাত্র প্রতারণা, হঠকারিতা কিংবা অসত্যায়নের লেশমাত্র প্রমাণ করতে পারবে না। বরং তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের সত্য ভাষণ ও চিরন্তন বাণীর আদর্শ। তাঁর এরূপ সত্য ও সনাতন ভাষণ ও বাচনই হাদীস নামে খ্যাত। শত সহস্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এরূপ সহস্র সহস্র সত্য ভাষণ আজকের বিশ্বব্যাপী মুসলমান জাতির পথ নির্দেশনার উপাদান।

৭ম বৈশিষ্ট্য ঃ স্থান-কাল ও পাত্রভেদে কথা ও বক্তব্য উপস্থাপন করা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যে এধরনের বৈশিষ্ট্য বিশেষিত ছিল। যেখানে যার সাথে যেরূপ কথা বা বক্তব্য পেশ করা দরকার তিনি সেখানে তার সাথে সেরূপ বক্তব্য প্রদান করতেন। তাঁর কথায় বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার ছাপ ফুটে উঠতো।

৮ম বৈশিষ্ট্য ঃ কথা ও বক্তব্যে থাকবে লালিত্য, অলংকারিত্ব, বাগ্মীতা ঃ রাসূলের কথা ও বক্তব্য এসব গুণাবলীতে সমৃদ্ধশালী ছিল। তৎকালীন আরবীয় কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ অলংকার শাস্ত্রে খ্যাত থাকা সত্ত্বেও রাসূলের বাণী ও বক্তব্যের সাথে তুলনীয় ছিল না। অলংকার ও লালিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বক্তব্যকে সহজেই নির্ণয় করা যেতো। তিনি তখনকার সময়ে এভাবে পরিচিত হতেন–

إِنَّهُ اَفْصَحُ النَّاسِ لِسَانًا وَ اَوْضَحُهُمْ بَيَانًا وَ اَوْجَزُهُمْ كَلَامًا *

"ভাষার লালিত্যে তিনি ছিলেন অনন্য, বিবৃতিদানে তিনি ছিলেন সবচে সুস্পষ্ট এবং তাঁর কথা ছিল ব্যাপক ও যথেষ্ট।"

চতুর্থ উপাদান ঃ কর্মের নিপুণতা (فَضَائِلُ الْاَعْمَالِ) ঃ

কর্মের নিপুণতা নির্ণীত হয়ে থাকে কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর।

১ম বৈশিষ্ট্য ঃ কর্ম পদ্ধতিতে থাকবে হীত-অহীত, মঙ্গল-অঙ্গলের স্পষ্ট নির্দেশনা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবনের কর্ম পদ্ধতিতে এই পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন। কোন

কাজ আমাদের জন্যে মঙ্গলময় আর কোনটি অমঙ্গলজনক তা তিনি কাজে ও কথায় দেখিয়েছেন এবং বলেছেন। অধিকন্তু মংগলময় কাজ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অমঙ্গলজনক কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন।

২য় বৈশিষ্ট্য ঃ কাজের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সমন্বয় ঘটবে। কিংবা শত্রু-মিত্রের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি হয়ে উভয়ের মিলন ঘটে। কোনো কাজে দ্বন্দ্ব বিরোধ কিংবা কলহ দেখা দিলে মধ্যস্থতাকারীর কর্মপদ্ধতি এমন নিপুণ হওয়া দরকার যাতে দ্বন্দের অবসান ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে উঠে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি এ ধারায় প্রবাহিত ছিল। যুদ্ধ অনিবার্য এমন শত সহস্র দ্বন্দের তিনি যে সমাধান দিয়েছেন তা তাঁর কর্মকুশলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে।

৩য় বৈশিষ্ট্য ঃ কর্মপদ্ধতি নরম বা চরম না হয়ে মধ্যম হওয়া। কোনো কাজে কোনো ব্যাপারে বিশেষতঃ জটিল ও দুরূহ বিষয়ে চরমপন্থা পরিহার করা বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার পরিণতি ভালো ও শুভ হওয়ার ভুরি ভুরি নজীর আছে। এধরনের হাজারো নজীর রয়েছে তাঁর কর্মপদ্ধতিতে।

৪র্থ বৈশিষ্ট্য ঃ কাজে আসক্তি ও অনাসক্তি থাকা।

পারলৌকিক জীবনকাল পরিহার করতঃ পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়া আবার পার্থিব জীবন বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র পারলৌকিক জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়া স্বীকৃত কিংবা সুদূর প্রসারী কর্মপদ্ধতি নয়।

আখিরাত বিমুখ দুনিয়াদারী কাজ এবং দুনিয়া বিবর্জিত আখিরাতের কাজ স্বীকৃত কর্ম নয়। উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সম্যক কাজই স্বীকৃত কাজ। রাসূলের কর্মপদ্ধতি এরূপ স্বীকৃত কাজের সাক্ষ্য। তিনি এ পর্যায়ে বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ دُنْيَاهُ لِاٰخِرَتِهٖ وَلَا اٰخِرَتَهٗ لِدُنْيَاهُ وَلٰكِنْ خَيْرُكُمْ لِمَنْ اَخَذَ مِنْ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ *

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে আখিরাতে সফলতার আশায় দুনিয়াদারী কাজ পরিত্যাগ করে না এবং দুনিয়ার সফলতার জন্যে

আখিরাতমুখী কর্ম ছেড়ে দেয় না। পরন্তু সে লোকটি উত্তম যে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন পূর্বক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকে।"

তিনি আরো বলেছেন—

نِعْمَ الْمَطِيَّةُ الدُّنْيَا فَارْتَحِلُوْهَا تَبْلُغُكُمُ الْاٰخِرَةَ *

"দুনিয়ার বাহন কতই না উত্তম, এ বাহনকে চালিয়ে নিতে পারলে আখিরাতে পৌছা সম্ভব।" অর্থাৎ পার্থিব জীবন ব্যবস্থা পরিহার করে আখিরাতের সফলতা সম্ভব নয়। বরং পার্থিব জীবন প্রবাহে এমন অনেক উপাদান আছে যেগুলোর আখিরাতে সফল হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি রয়েছে।

আজকের বিশ্বের বস্তুবাদী লোকগণ পার্থিব জীবনের সফলতাকে প্রকৃত সফলতা মনে করে থাকে। কিন্তু রাসূলের কর্মপদ্ধতির দীক্ষায় এরূপ দুনিয়াবী সফলতা চুড়ান্ত ও পরম সফলতা নয়। পারলৌকিক সমন্বিত সফলতাই প্রকৃত ও আসল সফলতা।

৫ম বৈশিষ্ট্য ঃ কর্ম পদ্ধতিতে থাকবে বৈধ-অবৈধের সীমারেখা।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও রাসূলের কর্মপদ্ধতি ছিল অনুপম ও অতুলনীয়। তৎকালীন আরব সমাজে যখন বৈধ-অবৈধের কোনো পরিচয় কিংবা মাপকাঠি ছিল না, তখন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্ম পদ্ধতির যে রূপ রেখা পেশ করেন তা আজও অম্লান হয়ে আছে। একজন ব্যক্তি একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র, একটি জাতির জন্য কিরূপ কর্মপদ্ধতি হওয়া উচিত, কোন ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলে উন্নত হওয়া যায়, এগুলোর দিক নির্দেশনা রয়েছে তাঁর কর্মধারায়। কি কাজ হালাল আর কোন ধরনের কাজ হারাম, এ বিষয়ে তৎকালীন লোকজন ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রাসূলের আগমনের পর তাঁর গৃহীত নীতিমালা হারাম-হালালের সীমারেখা টানে, জনগণ বৈধ ও অবৈধ কর্ম ধারার সাথে পরিচিত হোন। তিনি ব্যক্তি ও সমাজগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও জাতিগতভাবে সম্পৃক্ত সব ধরনের কর্মধারার যে রূপরেখা প্রদান করেন তা আজকের কম্পিউটার যুগেও সমপ্রযোজ্য।

৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ঃ শত্রুকে বশীভূত করা এবং মিত্রকে আরো অন্তরঙ্গ করার প্রবণতা থাকা কর্মপদ্ধতি গ্রহণীয় ও স্বীকৃত হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্থান ও কালের ভেদে রাসূলের কর্মপদ্ধতি এরূপ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধশালী। কতিপয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি কর্মসূচীতে

এমন কৌশল অবলম্বন করেন যদ্দারা শত্রুগণ পরাভূত এমনকি মিত্রে পরিণত হয়, আর মিত্রগণ আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

৭ম বৈশিষ্ট্য ঃ কর্মে সৌর্য-বীর্য ও সহনশীলতার সংমিশ্রন থাকবে। যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়তে হয়, সে ক্ষেত্রে যেমন সৌর্য-বীর্য , সাহসিকতা ও শক্তির প্রদর্শনী দরকার এবং কোনো অবস্থাতেই সহনশীলতা কিংবা শিথিলতার আশ্রয় নেয়া যায় না। ঠিক তেমনি আপোষ মিমাংসা কিংবা সন্ধি বা চুক্তিপত্র সম্পাদনের বেলায় শক্তি প্রয়োগ কিংবা অসহনশীলতার আশ্রয় নেয়া যায় না। বরং সেক্ষেত্রে চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রদর্শন করতে না পারলে কাজের সুফল লাভ করার পরিবর্তে বিপরীতই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাসূল কর্তৃক কর্ম নির্ধারণে এরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, রক্তারক্তি, হৈ-হাংগামার মতো জটিল ও কুটিল ব্যাপারে রাসূলের এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মসূচি তাঁর কর্মকুশলতা ও নিপুণতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এক ঃ 'দুরূদ' বলতে কি বুঝায়?

'দুরূদ' একটি ফার্সী শব্দ। এর আরবী শব্দ হলো 'সালাত' (صَلَاةٌ)। 'সালাত' শব্দটির বেশ কয়েকটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে।

প্রথমতঃ দোয়া ও বরকত অর্থে। যেমন কুরআনে আছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ * اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ *

"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া কর; নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তনা স্বরূপ।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ *

"আর তাদের মধ্য থেকে (মুনাফিক) কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো সালাত (দোয়া) পড়বে না এবং তার কবরেও দাঁড়াবে না।" (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الطَّعَامِ فَلْيَسْتَجِبْ، فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ *

"কেউ তোমাদেরকে খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে তাতে সাড়া দেয়া উচিত। আমন্ত্রিত ব্যক্তি রোযাদার হলে আমন্ত্রণকারীর জন্যে বরকতের দোয়া করা জরুরী।" (মুসলিম ঃ ১৪৩১, আহমদ ঃ ২/৫০৭)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং হাদীসে ব্যবহৃত 'সালাত' শব্দের অর্থ দোয়া এবং বরকত। বস্তুতঃ দোয়া করা, আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা করা ইবাদতরূপে

গণ্য। বরঞ্চ দোয়া ইবাদতের নির্যাস। দোয়া করা সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেছেন– اُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ *

"আমার কাছে চাও, আমি তোমাদেরকে দিব।" (গাফের ঃ ৬০)

তিনি আরো বলেছেন– أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ *

"যখন কোনো বান্দাহ্ আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার প্রার্থনা কবুল করে থাকি।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

তিনি দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে–

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً *

"তোমাদের রবের কাছে কাকুতি-মিনতি ও সংগোপনে প্রার্থনা কর।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫)

এধরনের আরো একটি আয়াত হলো– وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا *

"তাঁর কাছে চাও ভয় ও আশা সহকারে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৬)

উপরোক্ত আয়াতগুলো 'দোয়া করা' ইবাদত রূপে গণ্য হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। 'সালাত' শব্দটি বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় দোয়া ও বরকত অর্থে প্রযোজ্য হলো।

নবী রাসূলগণ ও আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন। তাঁদের দোয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন–

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ *

তারা (নবীগণ) সৎপথে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

আয়াতটিতে নবীগণের আশা ও ভয়-ভীতিসহ দোয়া করার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'সালাত' শব্দটি 'দোয়া' এর অর্থে রূপক, কিংবা আসল ও রূপক উভয় ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। একজন সালাত পাঠকারী বান্দাহ যখন আল্লাহর

সান্নিধ্যে কায়মনো বাক্যে আকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, গৌরব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে দোয়ায় লিপ্ত হয়, তখন তার অবস্থা কেবলমাত্র রূপক অর্থে দোয়ায় মশগুল থাকা বুঝায় না বরং সে প্রকৃতই আত্মলীনে পৌছে সালাতের স্বাদ আস্বাদন করে থাকে। বান্দার সাথে 'সালাত' শব্দের সংশ্লিষ্টতায় উপরোক্ত মর্মার্থ বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ তায়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট হলে। যেমন বলা হলো, সালাতুল্লাহ্ (صَلٰوةُ اللّٰهِ)

এমতাবস্থায় শব্দটির তাৎপর্য সাধারণ ও বিশেষ এ দু'ভাগে বিভক্ত।

(১) সাধারণ হলো, আল্লাহ্‌র রহমত (সালাত) তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্যে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হওয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ *

"তিনিই তোমাদের উপর রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ মাগফিরাতের দোয়া করেন। (সূরা আহযাব ঃ ৪৩)

নবী করিম আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুমিনদের জন্যে সাধারণভাবে দোয়া করতেন। তিনি দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى *

"আয় আল্লাহ! তুমি আবু আওফার বংশধরদের উপর রহমত কর।"
(বুখারী ঃ ৮/৪০৯)

এমনিভাবে তিনি একজন মহিলা ও তাঁর স্বামীর জন্যে দোয়া করলেন–

صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى زَوْجِكِ *

"আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার স্বামীর উপর রহমত নাযিল করুক।" (দারেমী ঃ ১/২৪)

দ্বিতীয় প্রকারের সালাত হলো, বিশেষভাবে প্রযোজ্য হওয়া। আল্লাহর এই 'সালাত' বা রহমত নবী-রাসূলগণ বিশেষতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে বিশেষ ও নির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য হওয়া।

আল্লাহ্‌র সাথে 'সালাত' শব্দের সম্পৃক্ততায় শব্দটির একটি অর্থ হলো 'রহমত'। যেমন দাহাক (রঃ) বলেছেন– صَلَاةُ اللّٰهِ رَحْمَتُهُ এবং صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র 'সালাত' হলো তাঁর রহমত এবং ফেরেশতাদের 'সালাত' হলো দোয়া। (ফজলুস সালাত ঃ ৯৬)

মুবাররাদ বলেছেন, 'সালাত' শব্দের আসল অর্থ 'রহমত' বা দয়া। আর এ রহমত হচ্ছে আল্লাহর রহমত। 'সালাত' শব্দটি মালায়িকাহ বা ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হলে শব্দটির তাৎপর্য হবে رِقَّةٌ, কোমলতা, নম্রতা, দয়া এবং اِسْتِدْعَاءٌ لِلرَّحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে রহমত নাযিল করার দোয়া করা। 'সালাত' শব্দটির উপরোক্ত তাৎপর্য সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত।

'সালাত' শব্দটির অপর অর্থ আল্লাহর মাগফিরাত লাভ করা। এ পর্যায়ে ইসমাঈল (রঃ) দাহাক থেকে বর্ণনা করে বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ *

আয়াতে صَلَاةُ اللّٰهِ বলতে আল্লাহ্‌র মাগফিরাত এবং صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ বলতে দোয়া বুঝানো হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম বুখারী (রঃ) আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করে বলেছেন–

صَلَاةُ اللّٰهِ عَلٰى رَسُوْلِهٖ : ثَنَاؤُهٗ عَلَيْهِ عِنْدَا لْمَلَائِكَةِ *

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর 'সালাত' পেশ করার অর্থ হলো, ফেরেশতাদের কাছে রাসূলের প্রশংসা ও স্তুতি-স্তবক তুলে ধরা।

ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ বুখারীতে উপরোক্ত কথাগুলো সনদসহ এভাবে বলেছেন–

حَدَّثَنَا نَضْرُبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ (اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ

يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَالَ : صَلَاةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ *

অর্থাৎ হাদীসটিতে صَلَاةٌ শব্দটি রাসূলের শানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রশংসা করা এবং ফেরেশতাগণ রাসূলের জন্যে দোয়া করার অর্থে প্রয়োগ হয়েছে।

'সালাত' শব্দটির অর্থ যদি হয় রাসূলের প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি দয়া করা এবং তাঁর মহিমা, গৌরব, মর্যাদা প্রকাশ করা, তাহলে আয়াতের অন্তর্গত 'সালাত' শব্দটির একাধিক তাৎপর্য বহন করা প্রয়োজন হয় না। বরং একক তাৎপর্য অর্থাৎ শব্দটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী স্বতঃই বিকশিত হয়ে উঠেছে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

আয়াতটি 'সালাত' এর ব্যাপারে নির্দেশসূচক। অর্থাৎ মানুষ রাসূলের প্রশংসা, তাঁর সম্মান, ফজিলত, বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আরাধনা করলে আল্লাহ্ তায়ালা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা অবগত করান যে, রাসূলের উপর আল্লাহ্ স্বয়ং রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁর জন্যে মাগফিরাত কামনা করেন। সুতরাং ঈমানদারদের জন্যেও 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ করার নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ এরূপ 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ করার মাধ্যমে রাসূলের মর্যাদা, ফজিলত ও সম্মানের স্বীকৃতি দেয়া হয়। আয়াতের صَلُّوْا এবং سَلِّمُوْا শব্দদ্বয় নির্দেশসূচক। صَلُّوْا শব্দটি ঈমানদার লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এর অর্থ হবে– নবীর জন্যে দোয়া করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) يُصَلُّوْنَ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন يُبَارِكُوْنَ শব্দ দিয়ে। এরূপ ব্যাখ্যা অর্থাৎ রাসূলদেরকে বরকতময় করার কথা কুরআনেও উল্লেখ আছে। যেমন ফেরেশতাগণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বললেন– رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ (সূরা হুদ ঃ ৭৩)

ঈসা আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করলেন- وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ যেখানেই আমি অবস্থান করি না কেন আমাকে বরকতময় কর।"

(সূরা মারয়াম ঃ ৩১)

এমতাবস্থায় শব্দটির বস্তুতঃ বরকতময় হওয়া স্তুতি-স্তবক, গুণ-গান ও মহিমা, গৌরব, মাহাত্ম ও ফজিলত পূর্ণ হওয়ার বিপরীত নয়। কেননা, যার মধ্যে এসব গুণাবলীর সমাহার ঘটে তিনিই তো বরকতময়। এ কারণেই নবী-রাসূলগণ বরকতময় হওয়ার যাচ্না করতেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের আধার হওয়া তো বলাই বাহুল্য।

দুই. দুরূদ পাঠের আহকাম

রাসূলের উপর 'সালাত' পেশ করার তিনটি পর্যায়। ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব।

রাসূলের উপর 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ করা শরিয়ত সম্মত একটি বিধান হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

ওয়াজিব ঃ সময়, কাল নির্ঘণ্ট নির্ধারণ না করে জীবনব্যাপী ন্যূনতম পরিমাণ দুরূদ পাঠ প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব। কেননা কুরআনের আছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা তাঁর (নবীর) উপর সালাত ও সালাম পেশ কর।"

(আহযাব ঃ ৫৬)

এ আয়াতের صَلُّوْا এবং سَلِّمُوْا শব্দদ্বয় أَمْر বা নির্দেশ সূচক শব্দ। উসূলে ফিকাহর মতে أَمْر নির্দেশ দু'ধরনের হয়ে থাকে। أَمْرٌ لِلْوُجُوْبِ অর্থাৎ ওয়াজিব সূচক এবং أَمْرٌ لِلنُّدُوْبِ অর্থাৎ ইচ্ছা সূচক। এ আয়াতের أَمْر ওয়াজিব সূচক হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকল ফিকাহবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং রাসূলের উপর সালাত ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব। তাছাড়া রাসূলের নাম স্মরণ করলে রাসূলের উপর সালাত পাঠ করা শ্রবনকারীদের জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায়। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলের নাম উচ্চারিত হওয়ার পর কেউ 'সালাত' পেশ না করলে তাকে অভিশপ্ত, বখীল, হতভাগা ও দুর্ভাগা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ওয়াজিব জাতীয় হুকুমের বরখেলাফ করলেই এরূপ শাস্তিযোগ্য পরিণামের কথা বলা হয়ে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাশাহুদে 'সালাত' পাঠ করা ওয়াজিব।

সুন্নত ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর 'দুরূদ' পাঠ করা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফিকাহবিদ ঐকমত্য হয়েছেন। ইমাম তাহাবী

কাযী আয়ায, খাত্তাবী এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ সময়ে দুরূদ পড়া ওয়াজিব বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

لَاتَكُوْنُ صَلَاةٌ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَصَلَاةٍ عَلَيَّ *

"কিরাত, তাশাহুদ এবং আমার উপর সালাত পেশ ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।" (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ঃ ৩/৪৪)

দুরূদ ছাড়া নামায শুদ্ধ না হওয়া দুরূদ পড়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

এমনিভাবে জানাযার নামাযে দুরূদ পাঠ করা সুন্নত। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জানাযার নামাযে সুন্নত হলো–

اَنْ يَقْرَاءَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

"সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং নবীর উপর দুরূদ পাঠ করা।"
(মুসতদরিকে হাকেম ঃ ১/৩৬০)

হযরত আবূ হোরাইরাহ (রাঃ) এবং আবু উমামাহ বিন সাহল (রাঃ) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

খুৎবা দানের প্রারম্ভে, আযানের পর, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, সাফা-মারওয়ায় উঠে, জুমআর দিন রাতে, কুরআন খতম করার সাথে, মুসিবত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে দুরূদ পড়া সুন্নত।

দোয়া করার আগে, মাঝখানে এবং শেষে দুরুদ পাঠ করা সুন্নত। কেউ এরূপ দুরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব বললেও হাদীস দ্বারা সুন্নত হিসেবেই প্রমাণিত। যেমন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, দোয়ার সময় প্রার্থনাকারী ও আল্লাহ্র মাঝখানে দুরূদ না পড়া পর্যন্ত আড়ালের সৃষ্টি হয়। দুরূদ পাঠ করলে আড়ালটি উঠে যায় এবং দোয়া কবুল করা হয়। আর দুরূদ না পড়লে পর্দা উঠানো হয় না, দোয়াও কবুল হয় না।(তারগীব ও তারহীব)

তিন. দুরূদ পড়ার ফজিলত

বিশ্বনবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠকারীর জন্যে হাদীসে যেসব ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের অধিকারী হওয়া ঃ

(ক) হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

"যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম ঃ ৪০৮)

(খ) আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

"যার কাছে আমার নাম স্মরণ করা হয়, আমার উপর তার দুরূদ পাঠ করা উচিত । আর যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন। (নাসায়ী ঃ ৬০)

(গ) আমের বিন রাবিআহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী আলাইহিস্ সালামকে বলতে শুনেছি–

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ اِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ فَلْيَقِلِ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيَكْثِرْ *

"কোনো বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এবার দুরূদ পাঠের সময় কম কিংবা বেশি করা বান্দাহর ইচ্ছা।"

(মাসনাদে আহমদ ৩/৪৪৫, ইবনে মাজাহ ঃ নং ৯০৭)

(ঘ) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً ـ فَلْيَقُلْ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيَكْثِرْ *

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পাঠকারীর উপর ৭০ টি রহমত দান করবেন। দুরূদ পাঠের পরিমাণ কমানো কিংবা বাড়ানো ব্যক্তির ইচ্ছা।"

(মাসনাদ আহমদ ঃ ২/২৭২)

২. গুনাহ্ কমে নেক বাড়ে ঃ

(ক) হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طِيْبَ النَّفْسِ، يُرٰى فِيْ وَجْهِهِ الْبِشْرُ، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : اَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طِيْبَ النَّفْسِ يُرٰى فِيْ وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ : اَجَلْ، اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِهَا عَشْرَحَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهٗ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا *

একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব খুশি হতে দেখা গেল, যেনো একটি শুভসংবাদের আভা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠলো। উপস্থিত লোকগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আজকে আপনাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে; আপনার চেহারায় যেনো শুভ সংবাদের সংকেত উদ্ভাসিত। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে একজন আগন্তুক (জিব্রাইল আঃ) এসে বললেন; আপনার উম্মতের কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে ১০টি নেকী দান করেন ১০টি গুনাহ মাফ করে দেন, ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যার অমর্যাদা রহিত করেন। (মাসনাদে আহমদ ঃ ৪/২৯)

(খ) আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ *

"যে আমার উপর একবার মাত্র দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন, ১০টি গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং ১০টি মর্যাদায় ভূষিত করবেন।" (মাসনাদে আহমদ ঃ ৩/১০২)

৩. দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং গুনাহ মাফ হয় ঃ

উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের তৃতীয় প্রহরে জাগ্রত হয়ে বলতেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَافِيْهِ *

"হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর ; প্রলয়ংকারী (কিয়ামত) আসবে, তখন পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী, মৃত্যু এসে সকলকে গ্রাস করে ফেলবে।"

উবাই বলেন, আমি বললাম–হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী পরিমাণে দুরূদ পাঠ করি। আমার দোয়ার কতটুকু পরিমাণ দুরূদ আপনার জন্যে নির্ধারণ করব? তখন তিনি বললেন– যতটুকু তুমি চাও। বললেন– এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন– যতটুকু তুমি ইচ্ছা কর। যদি তুমি পরিমাণ বাড়াও তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে কল্যাণকর। আমি বললাম– অর্ধেক। তিনি বললেন– তোমার ইচ্ছা। তবে পড়লে তোমারই মঙ্গল। আমি বললাম– তিন চতুর্থাংশ। তিনি বললেন– তোমার ইচ্ছা। তবে বাড়ালে সেটা হবে তোমার জন্যে উপকারী। আমি বললাম– আমার সবটুকু দোয়াই আপনার জন্যে নির্ধারণ করলাম। তিনি বললেন– إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ "তাহলে তো তোমার দুশ্চিন্তা দূরীকরণে এরূপ করাই যথেষ্ট এবং তোমার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (তিরমিজি ঃ নং ২৪৫৭, মুসতাদরাক ঃ২/৪২১)

৪. আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত লাভের মাধ্যম ঃ

(ক) আবদুল্লাহ বিন্ আমর বিন্ আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন–

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ. ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ. فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ سَلُوْا اَللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ، لَاتَنْبَغِىْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ أَنَا هُوَ. فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ *

"যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনো। তখন মুয়ায্যিন আযানে যা বলেন তোমরা তাই বলো। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দান করেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমাকে 'ওসীলাহ' দান করার জন্যে দোয়া কর। কেননা 'ওসীলাহ' বেহেশতের এমন একটা জায়গার নাম যেখানে আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাহ ছাড়া আর কারো অবস্থান করা সম্ভব নয়। আমার বাসনা, আমিই যেনো কাংখিত বান্দাহ হই। যে আমার জন্যে 'ওসীলাহ' পাওয়ার দোয়া করবে, তার জন্যে শাফায়াত করা বৈধ হবে।"

(মুসলিম নং ৩৮৪)

(খ) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

"যে সকালে ১০ বার সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তাবারানী)

(গ) হযরত রুবাইফাআ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ *

"যে মুহাম্মদের (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দুরূদ পাঠ করে এবং বলে আয় আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে তোমার কাছে তাঁকে উচ্চাসনে সমাসীন কর, তার জন্যে শাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।"

(মুসনাদ ঃ ৪/১০৮)

৫. দুরূদ পাঠকারীর নাম রাসূলের সমীপে উপস্থাপন করার মাধ্যম ঃ

(ক) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَاِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِيْ مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِيْ فَاِذَا صَلّٰى عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِيْ . قَالَ لِيْ ذٰلِكَ الْمَلَكُ : يَامُحَمَّدُ اَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ صَلّٰى عَلَيْكَ السَّاعَةَ *

"তোমরা আমার উপর বেশি পরিমাণে 'সালাত' পেশ কর, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা আমার কবরে একজন ফেরেশতা অকীলরূপে নিয়োগ করেছেন। আমার উম্মতের কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে তিনি আমাকে বলেন– হে মুহাম্মদ! অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেছেন। (দাইলামী ঃ ১/৯৩)

(খ) আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَكًا اَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ، فَلَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ اِلَّا اَبْلَغَنِيْهَا وَاِنِّيْ سَاَلْتُ رَبِّيْ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ عَبْدٌ صَلَاةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ عَشْرَ اَمْثَالِهَا *

"আল্লাহ্ তায়ালার এমন একজন ফেরেশতা রয়েছে যাকে বান্দার কথা শ্রবণ করার শক্তি দান করা হয়েছে। যে কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে তার নাম ঐ ফেরেশতার মাধ্যমে আমার কাছে পৌছানো হয়। আর আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যে, কোন বান্দাহ্ আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে তাকে যেনো ১০টি নেকী দেয়া হয়।(তিবরানী, বাযযার)

(গ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন–

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ *

"মহান আল্লাহর এমন ধরনের ফেরেশতা রয়েছে যাঁরা পৃথিবী ব্যাপী পরিভ্রমন করে থাকেন। আমার উম্মতের পেশকৃত সালাম তারা আমার কাছে পৌছে দেন।" (আহমদ ঃ ১/৩৮৭, নাসায়ী ৩/৪৩, দারেমী ঃ ২৭৭৭)

৬. জন সমাগম নিরর্থক হওয়া থেকে রক্ষা পায় ঃ

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوْا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِاللّٰهِ وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَامُوْا عَنْ اَنْتَنِ مِنْ جِيْفَةٍ *

"কোনো সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হওয়ার পর আল্লাহর যিকর এবং নবীর উপর দুরূদ পেশ করা ব্যতিরেকে সভাস্থল ত্যাগ করলে তারা যেনো আবর্জনার দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে এলো।"

(খ) আবু হোরাইরাহ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন–

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ـ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ *

"কোনো স্থানে লোকের সমাগম হলো অথচ ঐ সমাগমে আল্লাহর যিকর এবং নবীর উপর দুরূদ পাঠ হলো না, এরূপ সমাগমের জন্যে আফসোস এবং পরিতাপ। ইচ্ছা করলে তাদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে তিনি মাফও করে দিতে পারেন।"

(গ) আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ *

"কতিপয় লোক কোথাও একত্রিত হওয়ার পর সেখানে আল্লাহর যিকর এবং রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ না করলে কিয়ামত দিবসে তারা অনুতপ্ত হবে; যদিও তারা নেক আমলের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

৭. দোয়া কবুলের উপাদান ঃ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া লুকায়িত থাকে।" (মাজমাআ, তিবরানী)

৮. কৃপণতা ও রূঢ়তা পরিহারের উপায় ঃ

(ক) হোসাইন বিন আলী (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়াত করে বলেন–

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ *

"আমার নাম উল্লেখ করার পর যে আমার উপর 'সালাত' পেশ করে না সে হচ্ছে বখীল।"

(খ) আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ *

"মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচে কৃপণ যার কাছে আমার নাম স্মরণ করা সত্ত্বেও আমার উপর দুরূদ পড়ে না।"

(ইসমাইল বিন ইসহাক প্রণীত ফখজুছ সালাত ঃ ৪৩)

(গ) হাসান বসরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يُحْسَبُ أَمْرِىءٌ مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ *

'যে আমার নাম উচ্চারণের পর আমার উপর 'সালাত' পেশ করে না তাকে মানুষের মধ্যে কৃপণরূপে গণ্য করা হয়। (ঐ)

(ঘ) হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"কোনো ব্যক্তির কাছে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আমার উপর তার দুরূদ না পড়া রূঢ়তা ও অকল্যাণের নামান্তর।"

(اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلَاةِ পৃঃ ১৪৬)

৯. জান্নাত প্রাপ্তির দলীল ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ نَسِىَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ *

"যে আমার উপর দুরূদ পড়তে ভুলে যায় সে জান্নাতের পথ চিনতে ভুল করবে।" (ইবনে মাজাহ ঃ ৯০৮)

চার. দুরূদ পাঠের ফায়দা ও উপকারিতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করলে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে পাঠকারী যেসব বিষয়ে উপকৃত হবেন সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে নবীর উপর দুরূদ পাঠের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা হয়।

(২) 'সালাত' পেশ করার মাধ্যমে দুরূদ পাঠকারী এবং আল্লাহর সাথে একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ নবীর উপর 'সালাত' (রহমত) বর্ষণ করেন এবং বান্দাহ নবীর জন্যে 'সালাত' (দোয়া) করেন।

(৩) 'সালাত' পেশ করার ব্যাপারে দুরূদ পাঠকারী এবং ফেরেশতাদের সাথেও একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। কেননা কুরআনে ফেরেশতাগণ নবীর উপর সালাত (মাগফিরাত ও বরকত কামনা) পেশ করার কথা উল্লেখ আছে।

(৪) একবার মাত্র দুরূদ পাঠের বিনিময়ে ১০টি আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

(৫) দুরূদ পাঠকারী ১০টি পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোন।

(৬) তাকে ১০টি নেকী দেয়া হয়।

(৮) দুরূদ পাঠকারীর দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কেননা পঠিত দুরূদ বান্দাহর মনের বাসনা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

(৯) 'ওসীলা' নামীয় বেহেশতের উচ্চাসন লাভের ব্যাপারে রাসূলের জন্যে দোয়া করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত লাভ করা যাবে।

(১০) দুরূদ গুনাহ মাফের উপায়। সুতরাং পাঠকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

(১১) একজন দুরূদ পাঠকারী আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত ব্যক্তি রূপে প্রমাণিত হতে পারে।

(১২) কিয়ামত দিবসে রাসূলের নৈকট্য লাভের উপাদান।

(১৩) পাঠকারী ব্যক্তির কঠিন ও দুর্বোধ ব্যাপার সহজ-সরল হয়।

(১৪) দুরূদ মনোবাঞ্ছা পূরণের অন্যতম উপাদান।

(১৫) আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাদের মাগফিরাতের দোয়া পাওয়ার উপায়।

(১৬) দুরূদ মানুষের আত্মা ও দেহকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

(১৭) দুরূদ পাঠকারীকে তার মৃত্যুর আগেই বেহেশতের শুভসংবাদ প্রদান করে।

(১৮) দুরূদ কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে নাজাত পেতে সাহায্য করে ।

(১৯) 'সালাম' ও 'সালাত' পেশকারী ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সালাম' ও দোয়া ফিরে পেয়ে থাকে। (তারগীব তারহীব)

(২০) 'দুরূদ' ভুলে যাওয়া বস্তু স্মরণ করতে সহায়তা করে।

(২১) জনগণের সভা সমাবেশ, বৈঠক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বরকতময় ও সুশৃংখল হতে সাহায্য করে।

(২২) দারিদ্র্য বিমোচনে দুরুদের ভূমিকা রয়েছে।

(২৩) একজন ব্যক্তি কৃপণ অভিধায় থেকে বাঁচতে পারে যদি সে রাসূলের নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করে।

(২৪) বেহেশত লাভের রাস্তা দুরূদ পাঠকারীর জন্যে প্রশস্ত হয়ে যায়।

(২৫) দুরূদ জন সমাবেশ পুঁতিদুর্গন্ধময় ও আবর্জনাসম না হতে সাহায্য করে। কেননা যে সমাবেশে আল্লাহতায়ালার গুণ-গান এবং রাসূলের উপর সালাম ও সালাত পেশ করা হয় না, সে সমাবেশ পুঁতি দুর্গন্ধময় আবর্জনা সদৃশ্য হয়ে থাকে।

(২৬) বাক্যালাপ তথা যাবতীয় কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম ব্যাপক ও সঠিক হতে সাহায্য করে। কেননা, যে কাজ বা কথা আল্লাহ্র স্তুতি ও রাসূলের উপর সালাত পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় সে কাজ ব্যাপক হয়ে থাকে।

(২৭) 'দুরূদ' পুলসিরাত দ্রুত অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

(২৮) 'দুরূদ' বান্দাহকে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা করে।

(২৯) দুরূদ পাঠকারী আসমান ও যমীনে বসবাসকারীদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। কেননা ঐ ব্যক্তি দুরূদের মাধ্যমে রাসূলের মান-সম্মান, ইজ্জত ও মর্যাদার জন্যে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালাও তাঁকে ঐভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(৩০) দুরূদের ওসীলায় দুরূদ পাঠকারী নিজের, তার কাজ, বয়স এবং কল্যাণমুখী তৎপরতায় বরকত হয়। কেননা পাঠকারী দুরূদের মাধ্যমে রাসূল ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে থাকে। ফলে আল্লাহও তাকে ঐরূপ বরকতের প্রতিদান দিবেন।

(৩১) 'দুরূদ' আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার উপাদান। রাসূল নিজেই বলেছেন, তাঁর উপর সালাত পেশ করলে বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রহমত করবেন।

(৩২) রাসূলের মহব্বতের সাথে বান্দাহর মহব্বতের স্থায়িত্ব সৃষ্টি করে দুরূদ। রাসূলের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও স্থীতিশীল করতে সহায়তা করে দুরূদ। মহব্বতে রাসূল ঈমানী শক্তি ও গ্রন্থির অন্যতম উপাদান। একথা সহজাত যে, আকর্ষিত ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করা হয়ে থাকে। একজন উম্মত তাঁর নবীর উপর দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে। স্মরণ করার সময় তার সামনে ভেসে উঠে নবীর সৌমকান্তি, সুমহান আদর্শ, বিশ্বব্যাপী যুগোপযোগী কর্মধারা। ফলে নবীর প্রতি শ্রদ্ধা, আকর্ষণ, আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে নবীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

(৩৩) নবীর মহব্বত অর্জন করার ব্যাপারে দুরূদ অন্যতম উপায়। কেননা দুরূদ পাঠকারী নবীর মহব্বতে যখন সালাত পাঠ করে, তখন নবী আলাইহিস সালামও তাকে মহব্বত করেন।

(৩৪) দুরূদ বান্দাহর হিদায়াত ও জীবন্ত রাখার মোক্ষম উপায়। দুরূদ পাঠকারী যত বেশি পরিমাণে দুরূদ পাঠ করবে, রাসূলের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ তার অন্তরে ততোধিক পরিমাণে বদ্ধমূল হতে থাকবে। ফলে তার হৃদয় রাজ্য আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ, শিক্ষা ও নীতিতে উজ্জীবিত হতে বাধ্য। আর কারো মন-মানসিকতা, চরিত্র, অভ্যাস, নবীর আদর্শে রঞ্জিত হলে তাকে কোনো ধরনের অপকর্ম স্পর্শ করতে পারে না। শত বাধা, ঝড়-যঞ্ঝা তাকে টলাতে পারে না। হৃদয় রাজ্যে সে অনুভব করে এক অনাবিল শান্তি ও অনুপম সুখ।

(৩৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুরূদ পাঠকারীর নাম পেশ করার মিডিয়া হলো পঠিত দুরূদ। ফেরেশতাগণ পাঠকারীর নাম তাঁর কাছে পৌছে দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হঁয়েছে।

(৩৬) 'সালাত' অর্থাৎ 'দুরূদ' নির্ভয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করতে সাহায্য করে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর একজন উম্মত পুলছিরাতের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। সে কখনো ঝুলতেছিল আবার কখনো পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমার উপর তার পঠিত দুরূদ মূর্ত প্রতীকরূপে হাজির হয়ে তাকে পুলছিরাত অতিক্রম করায় সহায়তা করে।

(৩৭) মহান আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বান্দাহর কাছে নবীরূপে প্রেরণ করে মানব জাতির উপর যে ইহসান করেছেন এবং রাসূল আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করে উম্মতকে যে উপকার করেছেন সেগুলো অগনিত, অসহস্র। এ অবারিত ইহসান ও ঋণের হক যথার্থভাবে আদায় করা সহজ নয়। আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবীর মর্যাদার কারণে কোনো বান্দাহর দুরূদ পাঠকে ন্যূনতম হক আদায় করা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

(৩৮) 'দুরূদ' আল্লাহর যিকর, শুকর এবং বান্দার জন্যে তাঁর অগনিত নেয়ামতের সাথে পরিচয় লাভের মাধ্যম। বস্তুতঃ 'দুরূদ' রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর অনুসৃত নীতির অনুকরণ এবং তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুকরণ করা বুঝায়। রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রকারান্তে আল্লাহ্র মাগফিরাত ও মহব্বত পাওয়ার নামান্তর। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমার মহব্বত পেতে চাইলে আমার নবীকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। সুতরাং দুরূদ পাঠকারী আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করার দায়িত্ব বহন করে থাকে। আল্লাহ্র যিকর ও শুকর ঈমানের একটি মৌলিক অংশ। দুরূদের মৌলিক গঠন এবং তদানুযায়ী আমলের পরিমাণ যতই বাড়বে ঈমানী শক্তিও ততো বাড়তে থাকবে।

(৩৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত পেশ করার অর্থ দোয়া করা। আল্লাহর কাছে বান্দাহর চাওয়া-পাওয়া দু'ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) মানুষ আল্লাহর কাছে দিবা নিশি অহর্নিষ নিজের প্রয়োজনীয় সুখ-শান্তি কিংবা বালা-মুছিবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে দোয়া করে থাকে।

(খ) মানুষের অন্য ধরনের দোয়া নিজের জন্যে নয়। বরং আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের জন্য। 'দুরূদ' এ ধরনের দোয়া। অর্থাৎ নিজের জন্যে, রাসূলের জন্যে দোয়া করা। রাসূল হচ্ছেন সারা বিশ্বের একক ও অনন্য বরণীয় পূজনীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্যে দোয়া করা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার নামান্তর। অতএব, আল্লাহ তায়ালাও যে দোয়া করা ব্যক্তিকে ঐরূপ প্রতিদানে আপ্লুত করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

পাঁচ. কোন কোন জায়গায় 'দুরূদ' পড়া উচিত

আমাদের সমাজে যত্র-তত্র এমনকি সিনেমার বই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথাকথিত মিলাদের মাধ্যমে 'সালাত' পেশ করা হয়ে থাকে। কোথায় কেমন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করতে হবে তা তিনি স্বয়ং বলেছেন। এসব স্থান ও সময়গুলো আমাদের জানা থাকা দরকার। স্থানগুলো হলো ঃ

(১) নামাযে তাশাহুদের পর ঃ তাশাহুদের পর দুরূদ পাঠ করা কারো মতে ওয়াজিব হলেও ঐকমত্য হলো সুন্নত। রাসূলের উপর সালাত পাঠ ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না। এ পর্যায়ে আবু মাসউদ ওকবা বিন আমর আনসারী (রাঃ) ফাদালাহ ইবনে ওবাইদ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর উপর সালাত পেশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

(আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন ঃ

لَا تَكُوْنُ صَلَاةٌ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَصَلَاةٍ عَلَيَّ *

কিরাত, তাশাহুদ এবং আমার উপর দুরূদ পেশ ছাড়া নামায (পূর্ণ) হবে না। (ফাতহে কাদীর ঃ ১১/১৬৯)

(২) জানাযার নামায ঃ সালাতুল জানাযার সুন্নত নিয়ম হলো, ইমাম তাকবীর বলার পর সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং তৃতীয় তাকবীরে রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করবেন। (ইবনে কাসীর ঃ ৩/৫২১)

একবার আবু সাঈদ মাকবারী (রাঃ) আবু হোরাইরাহ (রাঃ)-কে জানাযার নামায আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ জানাযার তাকবীর বলার পর আল্লাহর তারীফ করলাম (আলহামদু সূরা পড়া) তারপর রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করলাম, অতঃপর বললাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَاَ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ *

(মুসান্নাফ ঃ ৬৪২৫)

(৩) জুমআ এবং দুই ঈদের খুতবা ঃ আউন বিন ওবাই জুহাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওবাই ছিলেন হযরত আলীর (রাঃ) শাসনামলের একজন প্রতিরক্ষা সৈনিক। তিনি বলেছেন ঃ হযরত আলী (রাঃ) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও ছানার পর নবী আলাইহিস সালামের উপর দুরূদ পাঠের পর বলতেন ঃ خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْبَكْرٍ، وَالثَّانِىْ عُمَرُ তিনি আরো বলতেন ঃ يَجْعَلُ اللّٰهُ الْخَيْرَ حَيْثُ شَاءَ আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করতেন সেভাবে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করতেন।

(আহমাদ ঃ ১/১০৬)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সালাতের খুৎবা শেষ করে রাসূলের উপর সালাত পেশ করার পর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَقُلُوْبِنَا وَذُرِّيَّتِنَا *

(৪) আযানের পর ঃ এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا

اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ . فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ *

"মুয়ায্‌যিনের আযান শ্রবন করার সময় তোমরা তার অনুরূপ অর্থাৎ আযানের জবাব দাও। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে ১০টি রহমত দান করবেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওসীলাহ্ এর প্রার্থনা কর 'ওসীলাহ' জান্নাতের একটি উচ্চাসনের নাম। আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্যে এ আসন সংরক্ষিত। বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার বাসনা। যে আমার জন্যে ওসীলাহ্ পাওয়ার ব্যাপারে প্রার্থনা করে তার জন্যে আমি অবশ্যই সুপারিশ করবো। (মুসলিম ঃ ৩৮৪)

এ জন্যেই আযানের পর দোয়া করতে হয়। দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ *

বস্তুতঃ এ দোয়ার মাধ্যমে রাসূলের জন্যে 'ওসীলাহ' নামীয় উচ্চাসন পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করা হয়।

(৫) আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সময় ঃ মুনাজাত করার সময় দুরূদ পাঠের ৩টি স্তর রয়েছে ঃ

(ক) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও প্রশংসা করার পরই দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে দোয়া করা। (খ) মুনাজাত করার প্রারম্ভে, মধ্যভাগে এবং শেষাংশে দুরূদ পাঠ করা। (গ) মুনাজাত করার প্রথমে এবং শেষে দুরূদ পাঠ করা। এ পর্যায়ে ফাদালাহ্ বিন ওবাইদ (রাঃ) বললেন ঃ নবী আলাইহিস সালাম একজন লোককে তার উপর দুরূদ পাঠ না করে মুনাজাত করার কথা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ عَجِلَ هٰذَا এটা তাড়াহুড়া। তারপর তিনি ডেকে তাকে ও অন্যান্যদেরকে বললেন ঃ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ *

তোমাদের কেউ মুনাজাত করতে চাইলে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি দিয়ে আরম্ভ করা উচিত। তারপর নবী আলাইহিস সালামের উপর দুরূদ পাঠ করা জরুরী। এরপর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ ঃ ১৪৮১, তিরমিজি ঃ ৩৪৭৭, নাসায়ী ঃ ৩/৪৪, আহমদ ঃ ৬/১৮, মুসতাদরাক ঃ ১/২৩০)

(খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ

كُنْتُ أُصَلِّيْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى. ثُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ *

আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সমভিব্যহারে নামায পড়তেছিলেন। নামাযান্তে বসে আল্লাহর প্রশংসা করলাম। তারপর নবীর উপর দুরূদ পাঠ করতঃ মনে মনে মুনাজাত করলাম। এরূপ করাতে নবী আলাইহিস সালাম বললেন ঃ এবার তুমি চাও, দেয়া হবে। (তিরমিজি ঃ ৪/১৫৬)

(গ) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ بَعْدُ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ أَوْ يُصِيْبُ *

তোমাদের কেউ আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে চাইলে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও গুণগান দিয়ে মুনাজাত আরম্ভ করা উচিত। অতঃপর নবীর উপর সালাত পাঠ করার পর দোয়া করবে। এভাবে মুনাজাত করা অধিকতর উপযোগী ও গ্রহণীয়। (জালাউল আফ্‌হাম ঃ পৃঃ ৩০৭)

(ঘ) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

مَا مِنْ دُعَاءٍ اِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى يُصَلِّى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاِذَا صَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنْخَرَقَ الْحِجَابُ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ، وَاِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاءُ *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত মুনাজাতকারী এবং আল্লাহর মাঝখানে একটি পর্দার সৃষ্টি হয়। মুনাজাতকারী রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করলে পর্দা ফেটে যায় এবং দোয়া কবুল করা হয়। আর নবীর উপর দুরূদ পাঠ না করলে দোয়া কবুল করা হয় না।

(তারগীব ও তারহীব ঃ ৩/১৬৫)

মোটকথা, পবিত্রতা (طَهَارَةْ) যেমন নামাযের জন্য (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ) চাবি স্বরূপ। তেমনি দুরূদ পাঠ দোয়া কবুলের জন্যে চাবি সাদৃশ। পবিত্রতা অর্থাৎ অযূ ছাড়া যেমন নামায শুদ্ধ হয় না, তেমনি দুরূদ পাঠ ছাড়া দোয়া কবুল হয় না।

এ ব্যাপারে আহমদ ইবনে আবুল হাওয়াবী বলেছেন, আমি আবু সোলাইমান দারানীকে একথা বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَسْأَلَ اللّٰهَ حَاجَتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَسْأَلْ حَاجَتَهُ وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبُوْلَةٌ وَاللّٰهُ اَكْرَمُ اَنْ يَرُدَّ مَا بَيْنَهُمَا *

যে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার ইচ্ছা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে তার মুনাজাত শুরু করা এবং শেষ করা উচিত। কেননা দুরূদ পাঠ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় ও স্বীকৃত কাজ।

(৬) মসজিদে প্রবেশ করা ও বাহির হওয়ার সময়ঃ এ পর্যায়ের হাদীস হলো ঃ (ক) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - وَاِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে নবী আলাইহিস সালামকে সালাম দিবে এবং বলতে হবে; আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা (আয় আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্যে খুলে দাও) এবং বাহির হওয়ার সময় বলবে ঃ আল্লাহুমা আজিরনী মিনাশ শাইতানির রাজীম (আল্লাহ, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমাকে রক্ষা কর) (ইবনে খুযাইমা ঃ ৪৫৩, ইবনে হাব্বান ঃ ৩২১)

(খ) ফাতেমা বিনতে হোসাইন (রাঃ) তাঁর দাদী ফাতিমাতুল কুবরা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করে বলেছেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ

وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ وَاِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِلَّااَنَّهٗ يَقُوْلُ : اَبْوَابَ فَضْلِكَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া সাল্লাম, আল্লাহুম্মাগফিরলী জুনুবী, ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা (আয় আল্লাহ মুহাম্মদের উপর রহমত ও শান্তি দাও; আয় আল্লাহ আমার অপরাধ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্যে খুলে দাও) এবং বাহির হওয়ার সময় অনুরূপ কথা বলতেন। তবে আবওয়াবা ফাদলিকা (তোমার ফজিলতের দরজাসমূহ) এর স্থলে বলতেন (আবওয়াবা রাহমাতিকা)।

তিরমিজিতে আছে ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন ঃ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ (সাল্লা আলা মোহাম্মাদীন ওয়া সাল্লামা)। (আবু দাউদ ঃ ৪৬৫, তিরমিজি ঃ ৩০৪, ইবনে মাজাহ ঃ ৭৭১, ইবনে সুন্নী ঃ ৮৭)

(৭) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে চড়া অবস্থায় ঃ এ পর্যায়ে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফায় চড়ে তিনবার বলতেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

(লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা–শরিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) তারপর নবী আলাইহিস সালামের উপর দুরূদ পাঠ করতঃ দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। অতঃপর মারওয়ায় চড়ে অনুরূপভাবে দোয়া করতেন। (কাযী ইসহাক ঃ ৮৭) (অবশ্য এরূপ করা দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত।)

এ বিষয়ে ওহাব বিন আজদাআ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে পবিত্র নগরী মক্কায় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে খুৎবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ، رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالصَّفَا فَيَقُومُ عَلَيْهَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ حَمْدُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ *

কেউ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলে তার ৭ বার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, মাকামে ইব্রাহীমে ২ রাকায়াত নামায পড়া, তারপর হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া উচিত। অতঃপর সাফা থেকে সাঈ শুরু করতে হবে। সাফায় কিছু সময় অবস্থান করতঃ বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে ৭ বার তাকবীর বলতে হবে। প্রত্যেক তাকবীরের মধ্যে হামদ ও ছানার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করতে হবে। তারপর নিজের চাওয়া-পাওয়ার জন্যে মিনতি জানাবে। মারওয়ায় অনুরূপ কাজ করবে। (কাযী ইসহাক ঃ ৭১)

(৮) জনগণের একত্রিত হওয়ার এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রাক্কালে ঃ এ বিষয়ের হাদীসগুলো হলো ঃ

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوْا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَامُوْا عَنْ اَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ *

কিছু লোক একত্রিত হওয়ার পর আল্লাহর যিকর এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত পেশ করা ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তারা যেনো ডাষ্টবিনের দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে আসলো। (আবু দাউদ তাইয়ালেমী ঃ ১৭৫৬, বায়হাকী, নাসায়ী ঃ ৪১১)

(খ) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) নবী আলাইহিস সালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ـ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ *

যে সমাগমে আল্লাহর যিকর এবং নবীর উপর সালাত পেশ করা হয় না তাদের জন্যে আফসুস ও অনুশোচনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। (মাসনাদ ঃ ২/৪৪৬, ৪৫২, ৪৮১, তিরমিজি ঃ ৩৩৮০, মুসতাদরাক ঃ ১/৪৯৬)

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ *

যে মজলিশে আল্লাহর যিকর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পেশ করা হয় না কিয়ামত দিবসে তাদের জন্যে আফসোস, যদিও তারা নেক আমলের দরুন বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মাসনাদ ঃ ২/৪৬৩, ইবনে হাব্বান ঃ ২৩২২, হাকেম ঃ ১/৪৯২, মুসতাদরাক ঃ ১/৪৯৬)

(৯) রাসূলের নাম উচ্চারণের সময় ঃ

এ পর্যায়ের হাদীস হলো ঃ (ক) হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا *

যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন আমার উপর তার সালাত পেশ করা উচিত। যে আমার উপর একবার সালাত পেশ করবে আল্লাহ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দান করবেন। (নাসায়ী ঃ ৬০, ইবনে সুন্নী ঃ ৩৮৩, বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ঃ ৬৪৩)

(খ) হযরত কাব বিন ওজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

أُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا ـ فَلَمَّا ارْتَقى دَرَجَةً قَالَ : اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقى الثَّانِيَةَ قَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا ارْتَقى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ : اٰمِيْنَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُ قَالَ : اِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ، فَقَالَ : بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْلَهُ ـ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقَّيْتُ الثَّانِيَةَ : قَالَ : بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ اٰمِيْنَ، فَلَمَّا رَقَّيْتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ : بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ : اٰمِيْنَ *

তোমরা মিম্বরের কাছাকাছি এসো। আমরা কাছাকাছি আসলাম। যখন তিনি মিম্বরের ১ম সিঁড়িতে চড়লেন তখন বললেন ঃ আমীন (কবুল করুন)। ২য় এবং ৩য় সিঁড়িতে চড়েও আমীন বললেন। মিম্বর থেকে নামার পর আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আজকে এমন কিছু শুনতে পেলাম যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ জিব্রাইল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ সে ব্যক্তি নিগৃহীত হোক যে রমযান মাস পেয়েও গুনাহ মাফ করতে সক্ষম হয়নি। আমি বললাম ঃ আমীন! ২য় ধাপে দাঁড়াবার পর জিব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর যে আপনার উপর সালাত পেশ করল না সে ব্যক্তি নিগৃহীত হোক। আমি বললাম ঃ আমীন! আমি যখন ৩য় ধাপে চড়লাম তিনি বললেন, যে তার বাবা-মাকে কিংবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পরও তাদের খেদমত করে নিজের স্থান বেহেশতে সংকুলান করতে সক্ষম হয়নি, সে ব্যক্তিও বিতাড়িত ও নিগৃহীত হোক। আমি বললাম আমীন।

(মুসতাদরাক ঃ ৪/১৫৩,১৫৪)

(গ) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عَنْهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ *

ঐ ব্যক্তি লজ্জিত হোক যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করার পরও আমার উপর 'সালাত' পেশ করে না। ঐ ব্যক্তি নিগৃহীত হোক যার গুনাহ মাফ হওয়ার আগেই রমযান অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এবং ঐ ব্যক্তিও অভিশপ্ত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পরও (তাদের সেবা যত্নের অভাবে অসন্তুষ্টির কারণে) বেহেশতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি।

(তিরমিজি ঃ ৩৫৩৯, সহীহুল জামে ঃ ৩৬০৪)

(ঘ) হযরত হোসাইন বিন আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بَخِيْلٌ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *

"সে ব্যক্তি বখীল যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না।" (সহীহুল জামে ঃ ৩৫৪৬ মাসনাদ ঃ ১/২০১)

(১০) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ঃ এ পর্যায়ে হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا ـ اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

"যে সকালে ১০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের সংকটময় কালে সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।

(তিবরানী, জামে সগীর–৫২৩৩)

(১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অবস্থান কালে ঃ এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন দিনার থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন–

رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقِفُ عَلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدْعُوْ لِأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا *

আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অবস্থান করত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ করতে দেখলাম। আরো দেখলাম, তিনি আবুবকর (রাঃ) ও ওমরের (রাঃ) জন্যে দোয়া করছেন।"

(তিবরানী, মুয়াত্তা ঃ ১/১৬৬)

(১২) বাজারে যাওয়ার জন্যে বের হওয়ার সময় কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগ জাতীয় কাজে বের হওয়ার প্রাক্কালে ঃ আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে–

مَا رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ جَلَسَ فِيْ مَأْدُبَةٍ وَلَاجَنَازَةٍ وَلَاغَيْرَ ذٰلِكَ، فَيَقُوْمُ حَتّٰى يَحْمَدَ اللّٰهَ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوْ بِدَعْوَاتٍ - وَاِنْ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى السُّوْقِ، فَيَاْتِيْ اَغْفَلَهَا مَكَانًا، فَيَجْلِسُ، فَيَحْمَدُ اللّٰهَ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْعُ بِدَعْوَاتٍ *

আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'সালাত' পেশ এবং মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান না করা পর্যন্ত আবদুল্লাহ্‌কে আমি কোনো খাবার খাওয়ার জন্যে, জানাযার জন্যে কিংবা অন্য কোনো কাজের জন্যে বসতে দেখিনি। যদি তিনি বাজারের উদ্দেশ্যে বের হতেন তাহলে বাজারের কোনো একটি নিভৃত জায়গায় এসে বসতেন। তারপর আল্লাহর হামদ করতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ করতেন এবং মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

(সাখাবী ঃ ২১৭)

(১৩) ঈদের নামায ঃ এ বিষয়ে হযরত আলকামাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়– একদিন ইবনে মাসউদ, আবু মুসা এবং হোযাইফা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের কাছে ওলীদ ইবনে ওকবা ঈদের আগে এসে জিজ্ঞেস করলেন–

اِنَّ هٰذَا الْعِيْدَ قَدْ دَنَا ، فَكَيْفَ التَّكْبِيْرُ فِيْهِ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : تَبْدَاءُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً تَفْتَحُ بِهَا الصَّلَاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُوْ وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ *

"ঈদ তো অত্যাসন্ন। ঈদের নামাযে তাকবীর বলার পদ্ধতি কি? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ তাকবীর বলে নামায শুরু কর এবং তোমার রবের প্রশংসা সূচক বাক্য বল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'সালাত' পেশ কর। তারপর দোয়া কর, তাকবীর দাও এবং এরূপ করতে থাক....... কথাগুলো (হুযাইফা (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ) সমর্থন করে বললেন– صَدَقَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ "আবু আবদুর রহমান সত্য বলেছেন।" (ইসমাঈল কাজীঃ৭৫৭৬, ইবনে কাসীরঃ৩/৫২১)

(১৪) জুমআ বারের দিন রাত ঃ এ সম্পর্কিত হাদীস হলো–

(ক) হযরত আউস বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعِقَةُ، فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ۔ قَالَ : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ ؟ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ، فَقَالَ، اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ *

"তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম দিবস হচ্ছে জুমাবার। এদিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনে তার মৃত্যু হয়েছে, এদিনে ফুৎকার দেয়া হবে এবং এ জুমআর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং শুক্রবারে তোমরা বেশি পরিমাণে আমার উপর 'দুরূদ' পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পঠিত দুরূদ সমূহ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার শরীর তো জীর্ণ হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের পঠিত 'সালাত' কেমন করে আপনার সমীপে পেশ করা হবে? তিনি জবাবে বললেন– পরম দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা নবীগণের শরীর ভক্ষণ বা ক্ষতি করা মাটির জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ : ১০৪৭, নাসায়ী : ৩/১৯, ইবনে মাজাহ : ১০৮৫ মাসনাদ : ৪/৮ মুসতাদরাক : ৪/৫৬০)

(খ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ـ فَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا *

"তোমরা শুক্রবারের দিনে ও রাতে বেশি পরিমাণে আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার 'সালাত' পেশ করে, আল্লাহ্ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দেন।" (বায়হাকী ঃ ৩/২৪৯)

(গ) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَىَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُصَلِّىْ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلَاتُهُ *

"তোমরা জুমাবারে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ পাঠ কর। কেননা এমন কেউ নেই যার শুক্রবারে আমার উপর পঠিত দুরূদ আমার সমীপে পেশ করা না হয়।" (হাকিম ঃ ২/৪২১, জামে সগীরঃ ১২১৬)

(১৫) খতমে কুরআনের সময় ঃ এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাইউম (রঃ) বলেছেন, কুরআন পাঠের সমাপ্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পেশ করা একটি মোক্ষম ও সময়োপযোগী স্থান ও কাল। এ সময়টি দোয়া কবুলের ক্ষণ। খতমে কুরআনের পর দোয়া করা আর দোয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া

সোনায় সোহাগা। আবুল হারিছ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) কুরআনের খতম অনুষ্ঠানে পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদেরকে একত্রিত করতেন। খতমে কুরআন দোয়া কবুলের যথার্থ ক্ষণ হওয়ায় সে লগ্নটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাতের সওগাত পেশ করাও যথোপযোগী হওয়া সহজেই অনুমেয়। (জালাউল আফহাম ঃ ৩৩০, ৩৩১)

(১৬) আয়াত পাঠের সময় ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেছেন–

اِذَا مَرَّ الْمُصَلِّىْ بِاٰيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاِنْ كَانَ فِىْ نَفْلٍ صَلِّىَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

"নামাযে পঠিত আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ আসলে নামায যদি নফল জাতীয় হয় তাহলে সে নবীর উপর দুরূদ পাঠ করবে। (জালাউল আফহাম ঃ ৩৫৫)

ইবনে সিনান বলেছেন, আব্বাস আল আম্বরী এবং আলী ইবনে মাদিনী বলেছেন–

مَا تَرَكْنَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كُلِّ حَدِيْثٍ سَمِعْنَاهُ *

"আমরা যখনই হাদীস শুনেছি তখন প্রতিটি হাদীস শুনার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা পরিত্যাগ করিনি।" (ঐ ঃ ৩৩৮)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন– আমার জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধু আমার কাছে বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমি স্বপ্নযোগে একজন আহলে হাদীস লোক দেখলাম, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ ذَاكَ، قَالَ : رَحِمَنِىْ اَوْ غَفَرَ لِىْ، قُلْتُ بِمَا ذٰلِكَ؟ قَالَ : اِنِّىْ كُنْتُ اِذَا اَتَيْتُ عَلٰى اِسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبْتُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

"আল্লাহ্ তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সে বললো– (আল্লাহ্) আমাকে রহমত করেছেন কিংবা আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমি বললাম

কেন? সে বললো– যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আমার সামনে আসতো তখনই আমি লিখতাম "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" সুফিয়ান সাওরী (রঃ)বলেছেন– একজন হাদীস চর্চাকারীর অন্য কোনো ফায়দা যদি না থাকে তাহলে এতোটুকু ফায়দাই যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর হাদীস চর্চা করার সময় একথা লিখা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"(ঐ ৩৩৭)

(১৭) বালা-মুছিবত সংকট মুহূর্তে এবং মাগফিরাত কামনার সময় ঃ এ পর্যায়ে উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে বলতেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اُذْكُرُوا اللّٰهَ، جَائَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَائَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، جَائَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ *

'হে লোকসকল! আল্লাহর যিকর কর, কিয়ামত আসবে, পরবর্তিতে প্রাসংগিক সব কিছুই তাকে অনুসরণ করবে, মৃত্যু এসব কিছুকে গ্রাস করে ফেলবে।"

ওবাই (রাঃ) বললেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ ـ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ فِىْ صَلَاتِىْ ؟ فَقَالَ : مَاشِئْتَ ـ قُلْتُ : اَلرُّبُعُ ؟ قَالَ : مَاشِئْتَ ـ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ .... *

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে 'সালাত' পেশ করে থাকি। আমার এ সালাতের কত অংশ আপনার জন্যে নির্ধারিত করব? তিনি বললেন– তুমি যতোটুকু ইচ্ছা কর? আমি বললাম– এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন– তোমার ইচ্ছা। যদি পরিমাণ বাড়াও সেটা তোমার জন্যে কল্যাণকর। এভাবে আমি দুই তৃতীয়াংশ এবং পরিশেষে সবটুকুই নবীর জন্যে নির্ধারণ করলে তিনি বললেন–

اِذًا تَكْفِىْ هَمَّكَ وَيَغْفِرُلَكَ ذَنْبَكَ *

"তাহলে এটাতো তোমার সংকট দূরীকরণ ও তোমার গুণাহ মাপের জন্যে যথেষ্ট হবে।" (তিরমিজি ঃ ২৪৫৭ মাসনাদ ৫/১৩৬ মুসতাদরাক ঃ ২/৪২১)

(১৮) **বিবাহের খুৎবায় ঃ** বিশ্বনন্দিত তাফসীরকার আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ (নিশ্চই আল্লাহ্) তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর 'সালাত' পেশ করেন----) এ বাণীর তাফসীর প্রসংগে বলেছেন– মহান আল্লাহ্ তোমাদের নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে ক্ষমা করেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর জন্যে মাগফিরাত কামনা করার নির্দেশ দেন। যেমন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ ....

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের সালাতে, মসজিদে, প্রতি জায়গায় এবং বিবাহের পয়গামে তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রশংসা কর। এরূপ সালাত পেশ করতে ভুলে যেয়ো না।

(১৯) **প্রতি জায়গায়ই 'সালাত' পড়া ঃ** এ পর্যায়ে হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا - وَصَلُّوْا عَلَيَّ : فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ تُبَلِّغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ *

"তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়োনা এবং আমার কবরকে মেলায় রূপান্তরিত করো না। আমার উপর 'সালাত' পেশ কর! তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পঠিত 'সালাত' আমার সমীপে পেশ করা হয়।"

(আবু দাউদ ঃ ২০৪২, মসনাদ ঃ ২/৩৬৭)

(২০) **দোয়ায়ে কুনুতের শেষভাগ ঃ** এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন হারিস বর্ণনা করেন যে, আবু হালীমাহ মোয়াজ দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পেশ করতেন।" (ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে রমযানে তারাবীহ পড়ানোর জন্যে ইমামরূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন)।

(كَانَ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقُنُوْتِ)

ইবনে কাইয়্যিম (র) বলেছেন, "রমযান মাসে পঠিত দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে 'সালাত' পড়া মোস্তাহাব।"

ছয় ঃ রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত দুরূদের শব্দাবলী ও বাক্যসমূহ

[বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমান সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' বা দুরূদ পাঠের রকমারী পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ছন্দে, গদ্যে-পদ্যে পঠন-পাঠের রেওয়াজ দেখা যায়। এসব বানানো দুরূদে ভক্তির আতিশয্যে শিরক ও বিদআতের অনুশীলন হয় পুণ্য ও নেক হাসিলের অগাধ বিশ্বাসে । রাসূলের শিখানো দুরূদ আমাদের জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা আমাদের কর্তব্য। তাই দুরূদ পড়ার জন্যে যে ধরনের বাক্য ও শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন সেগুলো পেশ করা হলো।] –অনুবাদক

(১) হযরত আবু মাসউদ ওকবাহ বিন আমর আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক লোক সায়াদ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাসরীফ আনলেন। আমাদের মধ্য থেকে বশীর বিন সায়াদ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন–

قَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ *

"আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আপনার উপর 'সালাত' পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর 'সালাত' পেশ করবো? তিনি বললেন–

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ *

"তোমরা বলো, আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আলি মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীমা, ওয়া বারিক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহিম।

আর সালাম তোমরা যেভাবে দিয়ে থাকো তাতো জানো। (আহমদ ঃ ৫/২৭৪, মুসলিম ঃ ৪০৫ নাসায়ী ঃ ৩/৪৫, ৪৬ তিরমিজি, ৩২২০ আবু দাউদ ঃ ৯৮০, ৯৮১, মুআত্তা ঃ ১/ ১৬৫, ১৬৬)

আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِىْ صَلَاتِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحْبَبْنَا اَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْاَلْهُ *

"হে আল্লাহ রাসূল! আপনাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি তো আমাদের জানা। নামাযের মধ্যে আপনার উপর আমরা 'দুরূদ' পাঠ করে থাকি। এমতাবস্থায় আমরা আপনার উপর অন্য সময় কিভাবে 'দুরূদ' পেশ করব? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর এরূপ নিশ্চুপ হওয়ায় আমরা লোকটির এরূপ প্রশ্ন না করাকেই পছন্দ করেছিলাম। পরক্ষণেই তিনি বললেন–

اِذَا اَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ...... *

"যখন তোমরা আমার উপর 'সালাত' (দুরূদ) পেশ করতে চাও তখন বলো– আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন নাবিয়্যীল উম্মিয়ী ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা---
(আহমদ ঃ ৪/১৯৯, মুসতাদরিক ঃ ১/২৬৮ ইবনে খুযাইমাহ)

(৩) আবদুর রহমান বিন আবু লাইলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব বিন ওজরাহ (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করতঃ বললেন–

أَلَا أَهْدِى لَكَ هَدْيَةً *

"আমি কি তোমাকে একটি উপহার দিব?" উপহারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, আমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল তাশরীফ আনলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ (হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) কিভাবে আপনাকে সালাম করতে হবে একথা আমরা জানি। (কিন্তু একথা আমাদের জানা নেই যে, কিভাবে আপনার উপর 'সালাত' পেশ করব? তখন তিনি বললেন–

قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

"তোমরা বল– আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুন মাজীদ"। অর্থাৎ, আয় আল্লাহ্‌ তুমি মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের পরিবারের উপর এভাবে রহমত বর্ষণ কর যেভাবে ইব্রাহীমের পরিজনের উপর রহমত করেছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত সম্মানিত। তুমি মোহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের এমনভাবে বরকত দাও যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের বংশধরদেরকে বরকত দিয়েছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত সম্মানিত।

[বুখারী --- ঃ ১/৬৩৫৭, মুসলিম ঃ ৪০৬ বুখারীর অপর বর্ণনা এরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى : قَالَ : لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : اَلَا اَهْدِىْ لَكَ هَدْيَةً ؟ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : بَلٰى ـ فَأَهْدِهَا لِىْ ـ فَقَالَ : سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؟ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ قَالَ : قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

এ সনদের হাদীসটিতে আলি ইব্রাহিমসহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপর রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর উপরে বর্ণিত হাদীসে শুধুমাত্র আলি ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের বংশধর) এর কথা বলা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র আলি ইব্রাহীম রেওয়ায়াত গুলো অধিকতর সহীহ। আর ঐ সব হাদীসে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিজনের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। (দ্রষ্টব্য ঃ ফাতহুল বারী ১১/১৫৮, ১৫৯)

(৪) আবু হুমাইদ আসসায়াদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবো? তখন তিনি বললেন–

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

"তোমরা বল– আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াযিহী ওয়া যুররিয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (বুখারী ঃ ফাতহুল বারী ঃ ১১/৬৩৬০, মুসলিম ঃ ৪০৭, আবু দাউদ ঃ ৯৭৯, নাসায়ী ঃ ৩/৪৯ ইবনে মাজাহ ঃ ৯০৫)

(৫) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল স)!! আপনার উপর 'সালাম' পেশ করার পদ্ধতি

তো আমার জানা? কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' পাঠের পদ্ধতি কি? তখন তিনি বললেন–

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ *

"তোমরা বল– আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন আব্‌দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া বারিক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা"। (বুখারী (ফাতহুল বারী) ১১/৬৩৫৮, নাসায়ী ঃ ৩/৪৯, ইবনে মাজাহ ঃ ৯০৩)

(৬) তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম– ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উপর কিভাবে আমরা 'দুরূদ' পাঠ করবো? তিনি বললেন–

قُلْ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

অবশ্য নাসায়ীতে উপরোক্ত দুরূদটির সনদ বর্ণনা হয়েছে এভাবে–

اِنَّ رَجُلًا أَتٰى نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ؟ قَالَ قُوْلُوْا *

অর্থাৎ একজন লোক আল্লাহর নবীর কাছে এসে বললো– হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উপর আমরা কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? তখন তিনি উপরোক্ত দুরূদটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা বলো--- (মুসনাদ ঃ ১/১২৬, নাসায়ী ঃ ৩/৪৮)

(৭) যায়েদ বিন খারিজাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম– কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন–

صَلُّوْا وَاجْتَهِدُوْا ثُمَّ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

"তোমরা 'সালাত পড়' এবং জিহাদ কর।" তারপর তোমরা বলো– আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

(মুসনাদ ঃ ১/১৯৯, নাসায়ী ঃ ৩/৪৯)

(৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– তোমরা যখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ কর; তখন খুব ভালো করে আদবের সাথে 'দুরূদ' পড়। তোমরা হয়তো জানো না যে, তোমাদের পঠিত 'দুরূদ' তাঁর কাছে পেশ করা হয়। উপস্থিত লোকগণ তাঁকে বললেন– আমাদেরকে 'দুরূদ' পাঠের বিষয়টি শিখিয়ে দিন। তখন ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন–

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

"আল্লাহুম্মা ইজ আল সালাওয়াতিকা ওয়া রাহমাতিকা ওয়া বরাকাতিকা আলা সাইয়্যেদুল মুরসালীন ওয়া ঈমামিল মুত্তাকীন ওয়া খাতিমিন নাবিয়ীন মোহাম্মাদু আবদিকা ওয়া রাসূলিকা। ইমামুল খাইর ওয়া কায়িদুল খাইর ওয়া রাসূলির রাহমাতি। আল্লাহুম্মাব আসহু মাকামাম মাহমুদান ইয়াগ বুতুহু বিহিল আউয়ালুনা ওয়াল আখিরুনা। আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। (ইবনে মাজাহ ঃ ৯০৬)

(৯) আবদুর রহমান বিন বশীর বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন কেউ জিজ্ঞেস করলো– ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে 'সালাম' দেয়া এবং আপনার উপর 'সালাত' পড়ার নির্দেশ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন। আপনাকে 'সালাম' দেয়ার ব্যাপারটি তো আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' বা দুরূদ পাঠ কিভাবে করবো? উত্তরে তিনি বললেন–

تَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ *

তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্রাহীম। আল্লাহুম্মা বারিক আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীম।" (ইসহাক কাযী ঃ ৭১)

[উপরে উল্লেখিত 'সালাত' বা 'দুরূদ' এর বাক্য এবং বাক্যস্থিত শব্দগুলো প্রায় এক ও অভিন্ন। রাবী বা বর্ণনাকারীদের (সনদ) বিভিন্নতার কারণে প্রায় আটভাগে দুরূদ এর বাক্যগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্যের মধ্যে শব্দ চয়নের পার্থক্য এতটুকু যে, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম হাদীসে عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ (ইব্রাহীমের উপর) শব্দদ্বয় নেই। এসব হাদীসে আছে اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ (ইব্রাহীমের বংশধর)। আবার ৬ষ্ঠ হাদীসে عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ শব্দদ্বয়

আছে। اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ শব্দদ্বয় নেই। ২য় হাদীসটিতে عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ "আলান নাবিয়্যীল উম্মী" অতিরিক্ত শব্দদ্বয় আছে। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম হাদীসে اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ "ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" শব্দত্রয়ের উল্লেখ আছে। ৪র্থ হাদীসে وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ শব্দদ্বয়ের অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে। ৮ম হাদীসটিতে অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত শব্দাবলী ছাড়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰواتَكَ .... يَغْبِطُهُ الْاَ وَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ *

রাসূলের গুণবাচক কতিপয় শব্দ সম্বলিত বাক্যের সংযোজন আছে। আবার ৯ম হাদীস যা আবদুর রহমান বিন বশীর বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে শুধুমাত্র اٰلِ مُحَمَّدٍ এবং اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এখানে عَلٰى مُحَمَّدٍ কিংবা عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ কোনোটাই নেই। শব্দ চয়নের সামান্য হের-ফের হলেও অর্থ ও মর্মার্থ এক ও অভিন্ন।] –অনুবাদক

সাত ঃ 'সালাত' এর হাদীসসমূহের রাবীগণ

মোহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'সালাত' বা দুরুদ পাঠের হাদীস গুলো যাঁরা রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের নামের একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) আবু মাসউদ ওকবাহ বিন আমর আল আনসারী আল বদরী (রাঃ)

(২) কাব ইবনে ওযরাহ (রাঃ)

(৩) আবু হোমাইদ আস সায়াদিয়ী (রাঃ)

(৪) আবু সায়ীদ আল খুদরী (রাঃ)

(৫) তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)

(৬) যায়িদ বিন হারিসা (রাঃ) তাঁকে ইবনি খারিজাহ নামেও ডাকা হতো।

(৭) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)

(৮) আবু হোরাইরাহ (রাঃ)

(৯) বোরাইদাহ বিন আল হোছাইব (রাঃ)

(১০) মহল বিন সায়াদ আস সায়াদী (রাঃ)

(১১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

(১২) ফাদালাহ বিন ওবাইদ (রাঃ)

(১৩) আবু তালহা আনসারী (রাঃ)

(১৪) আনাস বিন মালিক (রাঃ)

(১৫) ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)

(১৬) আমির বিন রাবিয়্যাহ্ (রাঃ)

(১৭) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)

(১৮) উবাই বিন কাব (রাঃ)

(১৯) আউস বিন আউস (রাঃ)

(২০) হাসান হোসেন বিন আলী (রাঃ)

(২১) ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাঃ)

(২২) আল বার্রা বিন আযিব (রাঃ)

(২৩) রুবাইফাআ বিন সাবিত আনসারী (রাঃ)

(২৪) যাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)

(২৫) আবু রাফি (মাওলা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (রাঃ)

(২৬) আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা (রাঃ)

(২৭) আবু উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ)

(২৮) আবদুর রহমান বিন বশীর বিন মাসউদ (রাঃ)

(২৯) আবু বোরদাহ বিন নিয়ার (রাঃ)

(৩০) আম্মার বিন ইয়াসীর (রাঃ)

(৩১) যাবির বিন সামুরাহ (রাঃ)

(৩২) আবু উমামাহ বিন সহল ইবনে হানীফ (রাঃ)

(৩৩) মালিক বিন হোবাইরাস (রাঃ)

(৩৪) আবদুল্লাহ বিন জাযায়িয্ যাবিদী (রাঃ)

(৩৫) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)

(৩৬) আবু যর (রাঃ)

(৩৭) ওয়াসিলাহ্ বিন্ আল আসকা (রাঃ)

(৩৮) আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

(৩৯) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)

(৪০) সায়ীদ বিন ওমাইর আনসারী (রাঃ)। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

(৪১) হিব্বান বিন মানকাজ (রাঃ)

আট ঃ 'দুরূদ' এ ব্যবহৃত শব্দাবলীর তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা

বর্ণিত হাদীসগুলোতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'দুরূদ' পাঠের ব্যাপারে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সে সব শব্দ সম্ভারের অর্থ, তাৎপর্য, রহস্য, তত্ত্ব সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। এসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

(ক) আল্লাহুম্মা ঃ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'দুরূদ পাঠের সূচনা শব্দ হলো আল্লাহুম্মা (اَللّٰهُمَّ)। শব্দটির অর্থ "ইয়া আল্লাহ"। শব্দটি আবেদন-নিবেদন ও চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয়না। অতএব এরূপ বলা হয় না اَللّٰهُمَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ইয়া আল্লাহ তুমি দয়ালু দয়াবান) বরং বলা হয় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ (ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর) বাক্যের মধ্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়ার জন্যে নিবেদন করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ শব্দটির শেষ অক্ষর তাশদীদযুক্ত মিম অক্ষরটি يَا হরফে নিদার (সম্বোধন বোধক শব্দ) পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং يَا اَللّٰهُمَّ (ইয়া আল্লাহুম্মা) বলা ঠিক নয়। এমত ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ সিবাবীয়াহ।

অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাশদীদযুক্ত মীম অক্ষরটি একটি উহ্য বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। উহ্য বাক্যটি হলো– يَا اَللّٰهُ اُمَّنَا بِخَيْرٍ পরবর্তীতে বাক্যটি পরিত্যক্ত হয়ে তাশদীদ যুক্ত মীম সংযোজিত হয়।

বসরার ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– তাশদীদ যুক্ত 'মীম' অক্ষরটি বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– زِرْقَةٌ (যিরকাতুন) শব্দটির শেষে মীম যুক্ত হয়েছে। এবং اِبْنٌ শব্দের শেষে মীম যুক্ত হয়ে اِبْنُمْ হয়েছে। শব্দদ্বয় দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তির আধিক্য বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে কাইয়িম (রাঃ) আদ্যাক্ষর মীম সম্পর্কে যা বলেছেন,

সেটাও আধিক্য বুঝায়। যেমন– هُوَ একবচনের বহুবচন هُمْ একবচনে أَنْتَ এর বহুবচন أَنْتُمْ একবচন ضَرَبْتَ এর বহুবচন ضَرَبْتُمْ একবচন إِيَّاكَ এর বহুবচন إِيَّاكُمْ একবচন إِيَّاهُ এর বহুবচন إِيَّاهُمْ শেষ অক্ষর মীমযুক্ত হয়ে ব্যক্তির আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

তাশদীদযুক্ত মীম অক্ষরটি আধিক্য, মহত্ত্ব, মৌলিকত্ব, তাৎপর্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ বলা যায়, যখন বেশকিছু বস্তু একত্রিত করা হয় তখন বলা হয় لَمَّ الشَّيْئُ يَلُمُّهُ কোরআনের (ফজর ঃ ১৯) আয়াত أَكْلًا لَّمًّا এর তাফসীরে বলা হয়েছে– নিজ অংশ এবং অপরের অংশ ভক্ষণ করলে অর্থাৎ পেটুক বা অতিলোভী লোকের বেলায় এ কথা বলা হয়েছে।

أُمٌّ শব্দটির শেষ অক্ষর মীমে তাশদীদ দ্বারা কোনো বস্তুর মৌলিকত্ব বুঝানো হয়েছে। মক্কা নগরীকে এ অর্থেই أُمُّ الْقُرٰى বলা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা মুহকাম আয়াতকে বলেছেন– هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ যেমনিভাবে حَمٌّ، أُمَّةٌ، أُمٌّ، أُمٌّ، رِمٌّ প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত মীমে তাশদীদ বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

আল্লাহর কাছে যে কোনো সময় যে কোন বস্তু চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে এরূপ শব্দ যুক্ত করার রহস্য এটাই যে, আল্লাহর সমস্ত গুণ ও গুণবাচক নামের সাহায্যে চাওয়া, আবেদন-নিবেদন করা। বান্দাহ্ যখন বলে اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা) তখন এর তাৎপর্য এটাই أَدْعُو اللّٰهَ الَّذِيْ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَالصِّفَاتُ الْعُلٰى بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ـ অর্থাৎ আমি এমন আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যাঁর অনেক সুন্দর নাম এবং উচ্চসিত গুণাবলী রয়েছে। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ কখনো দুর্যোগ ও পেরেশানীতে পতিত হবেনা যদি সে দোয়া করে এভাবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِىْ حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ ـ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ، اَوْاَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ، وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ، وَذِهَابَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ اِلَّا اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا)

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু উম্মাতিকা। নাসিয়াতী বি ইয়াদিকা মাদ্বিন ফিইয়া হুকমুকা, আদলুন ফিয়্যা কাদাউকা আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা। সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা আও আনযালতাহু ফি কিতাবিকা আও আল্লামতাহু আহাদান মিন খালকিকা আও ইসতাসারতা বিহি ফি ইলমিল গাইব, ইনদাকা আন তাজআলিল কুরআনা রাবিয়ী কালবী ওয়া নূরা সাদরী, ওয়া জালাআ হুযনী, ওয়া জাহাবা হাম্মী ওয়া গাম্মী, ইল্লা আযহাবাল্লাহু হাম্মাহু ওয়া গাম্মাহু, ওয়া আবদিলহু মাকানাহু ফারাহান।)

উপস্থিত সাহাবাগণ দোয়াটি শিখার জন্যে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন بَلٰى يَنْبَغِىْ لِمَنْ سَمِعَهُنَّ اَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ হ্যাঁ, যারাই শুনবে তাদেরই শিখা উচিত। (আহমদ ঃ ৩৭১২, ইবনে মাজাহ ঃ ২৩৭২, হাকিম ঃ ১/৫০৯)

অপর একটি দোয়া এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، يَاذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ *

(আবু দাউদ ঃ ১৪৯৫, নাসায়ী ঃ ৩/২৫, ইবনে মাজাহ ঃ ৩৮৫৮)

উপরোক্ত দোয়া দুটিতে আল্লাহর বিভিন্ন নাম ও উচ্চসিত গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, দোয়া তিন ধরনের ঃ

প্রথমত ঃ আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর নাম ও উচ্চসিত গুণাবলীর মাধ্যমে নিবেদন করা। وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (আরাফ ঃ ১৮০) ১ম প্রকারের দোয়ার মধ্যে এ আয়াতের প্রতিফলন হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ স্বীয় প্রয়োজনীয়তা নিজের দৈন্যতা ও অপারগতার কথা প্রকাশ করতঃ আকুতি মিনতি করা। যেমন এরূপ বলা–

أَنَا الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ الْمِسْكِيْنُ الْبَأسُ الذَّلِيْلُ الْمُسْتَجِيْرُ ـ

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের যাচ্না করা।

তিন প্রকারের দোয়া একত্রিত হলে তবেই সেটা পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার দোয়াই পারস্পরিকভাবে সম্পূরক।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দোয়ার মধ্যে এই ৩ ধরনের দোয়ার সমন্বয় দেখা যায়। তিনি প্রথমত বলতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا وَاِنَّهُ كَثِيْرًا আল্লাহ আমি আমার উপর অনেক জুলুম করেছি। তারপর আছে لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। তারপর বলতেন– فَاغْفِرْلِىْ সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

(বুখারী, ফাতহুল বারী ঃ ২/৮৩৪, মুসলিম ঃ ২৭০৫)

দোয়া শেষ করা হয় আল্লাহর দুটি গুণবাচক নাম দিয়ে।

হাসান বসরী (রাঃ) বলেছেন ঃ اَللّٰهُمَّ শব্দটি দোয়ার সমাবেশস্থল (Acadamy)

আবু রিফা আতারাদী বলেছেন– দোয়ার প্রারম্ভিক اَللّٰهُمَّ শব্দটি আল্লাহর ৯৯ টি নামের সমাহার।

নদর বিন শুমাইল বলেছেন– مَنْ قَالَ : اَللّٰهُمَّ، فَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِجَمِيْعِ اَسْمَائِهِ যে 'আল্লাহুম্মা' বললো সে যেন আল্লাহর সমস্ত নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো।

নয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আহমদ' ও 'মুহাম্মাদ' নামের তাৎপর্য ও বুৎপত্তি

বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৯৯ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। তন্মধ্যে মোহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) নামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, বিশ্বখ্যাত। মোহাম্মাদ শব্দটির উৎপত্তি حَمْدٌ শব্দ থেকে। (حَمْدٌ) 'হামদ' শব্দটি যে ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য প্রয়োগ হবে সে مَحْمُوْدٌ 'মাহমুদ' হিসেবে পরিগণিত হবে। مَحْمُوْدٌ বা প্রশংসিত বস্তু বা ব্যক্তির যাবতীয় মান-সম্মান, ইজ্জত -আবরু, স্তুতি-প্রশংসা শব্দটির মধ্যে নিহিত। এরূপ অর্থই হামদের হাকীকত বা তত্ত্ব।

(مُحَمَّدٌ) মোহাম্মাদ শব্দটি مَفْعَلٌ শব্দের ছন্দে গঠিত। যেমন- مَفْعَلٌ - مُبَجَّلٌ - مُعَظَّمٌ - مُحَبَّبٌ - مُسَوَّدٌ ইত্যাকার শব্দগুলো مَفْعَلٌ শব্দের মিত্রাক্ষর ছন্দে গঠিত। এরূপ ছন্দের শব্দ দ্বারা মৌলিক বস্তুর আধিক্য প্রকাশ পাওয়া বুঝায়। حَمْدٌ 'হামদু' শব্দটি যদি اِسْمِ فَاعِلْ (কর্তাকারক) রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহলে কর্তা ব্যক্তি থেকে মৌল বস্তু বার বার অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাওয়া বুঝা যাবে। যেমন- مُخْلِصٌ - مُبِيْنٌ - مُفْهِمٌ - مُحْكِمٌ শব্দাবলী ইলম, ফহম, বয়ান, ও খুলুছিয়াত এসব গুণাবলীর ধারক বাহকদের পক্ষ থেকে পর পর বেশি পরিমাণে প্রকাশ হওয়া বুঝায়। আর ইসমে মাফ্উল' اِسْمِ مَفْعُوْل রূপে ব্যবহৃত হলে মৌলিক বস্তুর দাবি কিংবা বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বার বার বাস্তবায়িত হওয়া বুঝায়। 'মোহাম্মদ' (مُحَمَّدٌ) শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْل এর রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে, কোনো প্রশংসাকারী বাস্তবে বার বার যার প্রশংসা বেশি পরিমাণে করেন কিংবা যিনি বার বার উচ্ছসিত প্রশংসার দাবি রাখেন।

আল্লাহর নামের মতো রাসূলেরও মৌলিক নামসমূহ রয়েছে। যুবাইর বিন মাতআম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُواللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ *

"আমার কতিপয় নাম আছে আমি মোহাম্মাদু আমি আহ্মাদু এবং আমি 'আলমাহী' আমার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা কুফরী মুছে দিয়েছেন।"

(বুখারী ঃ ফত্হুল বারী ঃ ৮/৪৮৯৬, মুসলিম ঃ ২৩৫৪)

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামগুলোর কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। নামগুলো ফজিলতপূর্ণ, বহু অর্থবহ এবং আল্লাহর মনোনীত। এগুলো যদি শুধুমাত্র বিভক্তি আকারে হতো তাহলে নামগুলো অর্থবহ হতো না এবং প্রশ্নসূচক হওয়াও বুঝা যেতো না। এ কারণেই হাস্সান (রাঃ) বলেছেন–

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيَجُلَّهُ ـ فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ *

"তাঁকে (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিয়ান গরিয়ান করার উদ্দেশ্যে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর নামে ভগ্নাংশ করে ফেলেন। ফলে আরশের অধিপতি হলেন 'মাহমুদ' (আল্লাহ্)। আর ইনি হচ্ছেন 'মোহাম্মদ'।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের উৎপত্তি حَمْدٌ শব্দ হওয়ায় তিনি مَحْمُوْد 'মাহমুদ' প্রশংসিত। তিনি 'মাহমুদ' আল্লাহর কাছে, তিনি 'মাহমুদ' ফেরেশতাদের কাছে, তিনি 'মাহমুদ'নবীগণের কাছে এবং তিনি 'মাহমুদ' বিশ্ববাসীর কাছে, যদিও কেউ অস্বীকার করে থাকে। বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে যে পরিপূর্ণ ও উচ্ছসিত বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে তাতে প্রতিটি জ্ঞানবানের কাছে তাঁর 'মাহমুদ' হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য। যারা অজ্ঞতা, হিংসা বিরোধীতা ও বিদ্রোহ করার মানসে এ সত্যটি মানতে চায়না তাদের কথা স্বতন্ত্র।

ধাতুগত দিক থেকে 'হামদ' শব্দের সূত্র ধরে তিনি (أَحْمَدُ ও مُحَمَّدٌ) 'মোহাম্মদ' এবং আহমাদ নামে অভিহিত। আর তাঁর উম্মতগণ হচ্ছেন حَمَّادُوْنَ 'হাম্মাদুন বা প্রশংসাকারীগণ অর্থাৎ সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে নবীর উম্মতগণ আল্লাহর 'হামদ' (প্রশংসা) করে থাকেন। উম্মতগণের 'সালাত' এর সূচনা হয় 'হামদ দিয়ে, খুৎবা শুরু করে 'হামদ' দিয়ে,

কিতাবের শুরু হয় ‘হামদ’ এর মাধ্যমে। এমনিভাবে লাওহে মাহফুজে আল্লাহর কাছে লিখা আছে, তাঁর (রাসূল) খলিফা ও সাহাবাগণ কুরআন লিখা শুরু করেন ‘হামদ’ দিয়ে এরং হাশরের মাঠে ‘হামদ’ এর ঝাণ্ডা ধারণ করবেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে। বিচার দিনে নবী আলাইহিস সালাম উম্মতের শাফায়াতের জন্যে যখন মহান আল্লাহর সমীপে সিজদা করবেন তখন তাঁকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে এ বলে যে, তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করবেন উচ্চসিতভাবে। তিনি হচ্ছেন ‘মাকামে মাহমুদের’ মালিক! মাকামে মাহমুদ বেহেশতের এমন একটি উচ্চসিত স্থান যা পাওয়ার জন্যে আগে-পরের সকলেই কামনা করেছেন। এ স্থানটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا *

“রাতের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়তোবা আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন।”

(আসরা ঃ ৭৯)

‘মাকামে মাহমুদ এর ফজিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইবনে উবাই হাতেম ইবনে জারীর আবদ বিন হুমাইদ প্রমুখ তাফসীর কারকগণের গ্রন্থে বিশদ বিবরণ রয়েছে। যিনি এমন উচ্চাসনে সমাসীন হতে সক্ষম তিনিই সত্যিকার অর্থে ‘মাহমুদ’ বা প্রশংসিত। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্থানটি তাঁর জন্যে নির্ধারিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। কেননা তাঁর হেদায়াত, ঈমান, ইলম, আমল ছিল অতুলনীয়। তাঁর আগমন ও প্রচেষ্টায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মানবজাতি মুক্তি লাভ করে। শিরক, কুফর, অন্যায় ‘অবিচার’ গোমরাহীর স্থলে তাওহীদ, ন্যায়পরায়ণতা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা হয়। অগ্নিপূজা, মূর্তিপূজা ও তারকা পুজার অবসান ঘটে। সারা বিশ্বের আরব অনারব সাম্রাজ্যে সঠিক ও বিশুদ্ধ দ্বীনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অন্ধজনে আলো পায়, জ্ঞান প্রসারিত হয়, গরীব ধনী হয়। রোগী সেবা পায়, শত্রু মিত্র হয়। মারামারি হত্যা-লুঠতরাজ, চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়। উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ মুছে যায়। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সম্প্রীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়।

মানুষ তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। মানব সৃষ্টির রহস্য উদ্দেশ্য কি? তার গন্তব্যস্থল কোথায় এসব সম্পর্কে সজাগ হয়। রাসূলের আগমনে মানুষ আরো জানতে পারলো খারাপ কাজের ভয়াবহ পরিণতি এবং ভালো কাজের অনাবিল শান্তি ও পুরস্কারের কথা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা হলো স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়া সাল্লাম 'মাহমুদ' তিনি 'মোহাম্মদ' তিনি 'আহমদ' আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'মাহমুদ' বা প্রশংসিত হওয়ার উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ إِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ *

"এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ রয়েছে।" (আনকাবুত ঃ ৫১)

কুরআনের লিখিত কথাগুলো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। যে পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে সে পদ্ধতির পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। এমন কোনো সৎ কাজ নেই যার নির্দেশ তিনি দেননি। আবার এমন কোনো অসৎ কাজ নেই যা থেকে তিনি বিরত রাখেননি। তিনি নিজেই বলেছেন–

مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْئٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَي الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهٖ،
وَلَا مِنْ شَيْئٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ......

"যে জিনিস তোমাদের জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয় সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দিয়েছি; আর যে কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদের অবশ্যই নিষেধ করেছি....। (মাজমাআ ঃ ৮/২৬৩, ২৬৪)

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেন–

لَقَدْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا طَائِرٌ يَقْلِبُ
جَنَاحَيْهِ فِى السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ عِلْمًا *

"একথা সত্য যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে চির দিনের জন্যে চলে গেছেন। কিন্তু আকাশে পাখী তার ডানা মেলে কেমন করে উড়ে বেড়ায় সে রহস্য সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন। (মুসনাদ ঃ ৫/১৬২)

ফলে পরিচয় মিলে গাছের। রাসূলের কর্ম তৎপতায় জানা যায় তাঁর নাম কি হওয়া উচিত। তিনি চরিত্রে ছিলেন সর্বোচ্চ, আমানতদারীতে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, কথায় ছিলেন মহাসত্য, ধৈর্যধারণে ছিলেন একান্ত, দান-সদকায় ছিলেন উদার, শৌর্য-বীর্যে ছিলেন কালজয়ী, ক্ষমায় ছিলেন মহান, সহনশীলতায় ছিলেন দৃঢ়। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের (রাঃ) হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বর্ণিত কথাগুলো বললেন এভাবে–

مُحَمَّدُ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ، سَمَّيْتُهُ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَصَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ، وَلاَيَجْزِى السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ، وَلَنْ اَقْبِضَهُ حَتّٰى اُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءُ بِأَنْ يَقُوْلُوْا : لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَفْتَحَ بِهِ اَعْيُنًا عُمْيًا وَاٰذَا نًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا *

"মোহাম্মদ আমার বান্দাহ, আমার রাসূল। আমি তাঁর নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল। তার মধ্যে কঠোরতা নেই, নেই কোনো রূঢ়তা ও হিংস্রতা। তিনি নিরব, বাজারের হৈ-হোল্লোড় তাঁর মধ্যে নেই। তিনি বড়ই সহনশীল, ক্ষমা মার্জনাকারী, কারো খারাপ কাজের মুকাবিলায় তিনি খারাপ করেন না। তাঁর পঠিত لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এ বাক্যের মুর্ছনায় বক্র ও বিভ্রান্ত জাতি সহজ-সরল হয়ে যায়। তাঁর সান্নিধ্যে অন্ধ দেখতে পায়, বধির শুনতে পায়, বোবা কথা বলতে সক্ষম হয়, নির্দয় লোক দয়াদ্র হয় এবং চেতনা বিহীন ব্যক্তি সচেতন হয়ে উঠে। (বুখারী, ফতহুল বারী ঃ ৮/৪৮৩৮)

দয়া ও স্নেহ মমতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম, দ্বীন ও দুনিয়াবী কল্যাণে তিনি ছিলেন মহান, ভাষার অলংকারে, বাগ্মীতার আকর্ষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সবর, সহনশীলতা ও পরোপকারে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না।

জিম্মাদারী, আমানতদারী, ওয়াদা রক্ষায় তিনি ছিলেন অনন্য। বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতায় তিনি ছিলেন অপূর্ব। প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন দূরদর্শী।

বিশ্বনবীর উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হওয়া কেবলমাত্র কথার ফুলঝুড়ি নয়। যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন খুবই কাছ থেকে, তাদের অন্যতম হলেন হযরত আলী (রাঃ)। তিনি বলেছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً وَاَلْيَنَهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ يَقُوْلُ فَاعِتَهُ : لَمْ اَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

(শামায়িলি তিরমিযি ঃ ৬, সুনান ঃ ৩৬৪২)

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বক্ষের ধারক। অর্থাৎ তাঁর হৃদয় ছিল আকাশের মতো বিশাল, সাগরের মতো অথৈ, মানব দানব, পশু-পাখি, গাছ তরু, লতা-পাতা সবকিছুর কল্যাণের ব্যাপারে তাঁর হৃদয় ছিল অবারিত, বিস্তীর্ণ। মনে হয় যেনো দুনিয়ার সমগ্র মংগল ও কল্যাণের আঁধার হচ্ছে রাসূলের হৃদয়মন।

কথায় ছিলেন তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। এমনকি তাঁর শত্রুগণও একথা অকপটে স্বীকার করেছে যে, রাসূল তাঁর ৬৩ বৎসর জীবন সায়াহ্নে একটিবারও অসত্য বা মিথ্যা কথা বলেননি। ৬৩ বৎসরের দীর্ঘ জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, প্রতিকূল-প্রতিরোধ বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ছোট-বড় কোনো ধরনের মিথ্যা বলার আপবাদ দিতে পারেনি।

একবার আবু জাহিলের ভাগীনা মুসাউর বিন মাখরামাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন মামুজান! মোহাম্মদকে (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) তোমরা কখনো মিথ্যা বলার অপবাদ দিয়েছো কি? উত্তরে সে বললো–

وَاللّٰهِ يَا ابْنَ اُخْتِىْ! لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ وَهُوَشَابٌّ فِيْنَا الْاَمِيْنُ ....

“আল্লাহর কসম! হে ভাগিনেয়, মোহাম্মদ এমন একজন যুবক, যে আমাদের মাঝে ‘আল আমিন’ বিশ্বাসী বলে অভিহিত হতো। ভাগীনা বললেন, তাহলে সত্যবাদীকে অনুসরণ করছেন না কেন? আবু জাহিল বললেন, কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা ‘বনী কুসাই’ আগত হাজীদেরকে পানি পান করায়, কাবা ঘরের চাবি তাদের হাতে, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ তারাই করছে। এমতাবস্থায় নবুয়্যাতও যদি তাদের অধীনে চলে যায়, তাহলে আমরা তো একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে যাই।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, একবার আবু জাহিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো– তুমি মিথ্যাবাদী এরূপ ধারণা আমরা কখনো করি না। তবে তোমার ধর্মগ্রন্থকে অসত্য মনে করি।

কুরআনের কতিপয় জায়গায় كِذْبٌ মিথ্যা অপবাদের যে কথার উল্লেখ আছে তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা বলা নয়। বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে (اٰيَاتٌ) মিথ্যা বলা। (আনআম ঃ ৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যা)

তিনি ছিলেন সবচে মোলায়েম ও নম্র স্বভাবের ব্যক্তিত্ব। ঘনিষ্ঠের চেয়েও ঘনিষ্ঠ, আপনের চেয়েও আপন ছিলেন তিনি। কেউ ডাকলে দৌড়ে যেতেন, কারো প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কেউ চাইলে তিনি কখনো ‘না’ বলতেন না। পরামর্শ ভিত্তিক কাজে সকলের পরামর্শ শুনতেন। কল্যাণ ও গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতেন। দুষ্ট প্রকৃতি ও স্বার্থ প্রণোদিত লোকদেরকে ক্ষমা করতেন। যে একবার তাঁর সাথে কথা বলেছে সে মুগ্ধ হয়েছে।

তিনি ছিলেন সংগ ও সম্পর্ক স্থাপনে অদ্বিতীয়। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁর সংগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছে। তিনি কখনো কাউকে কটু কথা বলেননি, কারো প্রতি ভ্রুকুটি করেননি। কাউকে দেখে তাঁর চেহারা মলিন হয়নি। বরং সংগী সাথীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অসাধারণ। তাঁর সহনশীলতা ছিল অনন্য।

হোসাইন (রাঃ) বলেছেন, আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের সাথে আচরণের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُقِ، لِيْنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ، وَلَاصَخَّابٍ، وَلَافَحَّاشٍ، وَلَاعَيَّابٍ، وَلَامَدَّاحٍ .....

"তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, কোমল মতি, সহজ প্রকৃতির। রূঢ়তা কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। কটুকথা, অনর্থক বাক্যালাপ, হৈ-হুল্লোড়, শোরগোল ইত্যাকার সহজাত ত্রুটি থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি যখন কথা বলতেন উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী মন্ত্র মুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনতেন। মনে হচ্ছিল, যেনো তাদের মাথায় রয়েছে একটি উড়ন্ত পাখি। তিনি ৩টি বস্তুকে পরিহার করে চলতেন, নারী, অযথা বাক্যালাপ এবং অধিক পরিমাণে জমা করা। তিনি কথা বলার পর অন্যরা কথা বলতেন। অনুমতি ছাড়া কেউ সামনে কথা বলতো না। অর্থাৎ, কথা বলার শালীনতা, ভদ্রতা, সৌজন্য সবই তাঁর মধ্যে ছিল পরিপূর্ণরূপে।

আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো দুটি গুণে গুণান্বিত করেন। গুণ দুটি হলো اَلْاِجْلَالُ وَالْمَحَبَّةُ প্রভাব ও মহব্বত। যে কেউ তাঁর দিকে আচমকা তাকালেই সে তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাঁর প্রভাব ও সম্মানে এমনকি শত্রুর হৃদয় মনও ভরে উঠত। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে। আর তাঁর অনুসারী সাহাবাগণও তাকে ভালবাসতেন সম্মানও প্রভাব দিয়ে। তাঁকে ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে নেই কোনো কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা। এরূপ অকৃত্রিম ও নিখাঁদ সম্মান ও প্রীতি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই লাভ করতে সক্ষম যার মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি, মান সম্মান ও প্রেম-প্রীতির উপাদান ষোলকলায় বিদ্যমান। আর তিনি হচ্ছেন একক ব্যক্তি আমাদের নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, মানুষকে ভালবাসা, মানুষকে সম্মান করা একটি ধর্মীয় নির্দেশ। তবে এ ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন হতে হবে আল্লাহকে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার অধীন। আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর মাগফিরাত লাভের জন্যে তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। বস্তুত প্রত্যেক নবীর উম্মতগণই তাদের নবীগণকে আল্লাহর ভালবাসা ও সম্মানের অধীন হয়ে সম্মান করতেন, ভালবাসতেন।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন– 'একজন মুমিনের ঈমানী জীবিকা হলো চরিত্র মাধুর্য ও স্বাভাবিক প্রভাব'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ যাকে মহব্বত সম্মান ও প্রভাবের সমন্বয়ে তৈরী ঈমানের লেবাস পরিধান করিয়েছেন, তিনি নিজেও অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং অপরগণও স্বাভাবিক ভাবেই তাকে সম্মান করবেন, ভালবাসবেন। এ কারণেই দেখা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামগণের রাসূলের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার যে নজির স্থাপন করেছেন তা বিরল, ইতিহাস খ্যাত। তাঁদের আনুগত্য ও ভালবাসার রেকর্ড আজ অবধি কেউ ভংগ করতে পারেনি।

উরওয়াহ বিন মাসউদ কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

يَا قَوْمُ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَفَدْتُ عَلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالْمُلُوْكِ فَمَارَاَيْتُ مَلِكًا يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَحُدُّوْنَ النَّظْرَ اِلَيْهِ تَعْظِيْمًا لَهُ، وَمَا تَخْتِمُ تُحَامَةً اِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْلُكُ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ ـ وَاِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ وَضُوْءَهُ *

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি পারস্য ইরানসহ অনেক দেশের রাজা বাদশাদের সাথে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করেছি। কিন্তু মোহাম্মদ (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথীরা তাঁকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন, এমন অপূর্ব সম্মান আর কোনো রাজ দরবারে আমি দেখিনি। তাঁর সম্মানার্থে কোনো সাহাবী তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে না, সবাই আনত চোখ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। তিনি থু থু ফেললে সে থু থু উপস্থিত সাহাবীগণের কেউ না কেউ হাতে ধারণ করতঃ তা বক্ষে ও চেহারায় মর্দন করেন। তিনি অযু করার ইচ্ছা করলে অযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু যোগান দেয়ার জন্যে সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। (বুখারী ফতহুল বারী ঃ ৫/২৭৩১ দীর্ঘ হাদীসের অংশ)

যেসব উপাদান থাকলে একজন ব্যক্তির বার বার প্রশংসা করতে হয় সেসব মৌলিক উপাদান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে

পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকায় তাঁর নাম 'মোহাম্মদ' হওয়া সার্থক হয়েছে। কেননা নাম ও কাজের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যতা।

'মোহাম্মদ' ও 'আহমদ' নামদ্বয়ের মধ্যে দুদিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত ঃ 'মোহাম্মদ যিনি তিনিই 'মাহমুদ' অর্থাৎ যিনি বার বার প্রশংসিত। 'মোহাম্মদ' শব্দটি দ্বারা প্রশংসাকারীদের (حَامِدٌ) সংখ্যা বেশি পরিমাণে হওয়া বুঝায়। আর 'আহমদ' শব্দটি اِسْمِ تَفْضِيْل (Superlative degree) হওয়ায় শব্দটি একথার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক অন্য কোনো ব্যক্তিত্ব প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। প্রশংসা পাওয়ার তিনিই হচ্ছেন যোগ্যতর ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। 'মোহাম্মদ' শব্দের মধ্যে নিহিত সংখ্যার আধিক্য (Quantity) আর আহমাদ শব্দের মধ্যে রয়েছে মানগত ও গুণগত আধিক্য (Quality).

দ্বিতীয়ত ঃ 'মোহাম্মদ' শব্দটি দ্বারা বার বার প্রতিবার প্রশংসা করা বুঝায়, যে কারণে তিনি 'মাহমুদ' নামেও অভিহিত। আর 'আহমদ' শব্দটি এ কথার ইংগিত যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভু দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করেন। দুনিয়াবাসীর যারা তাঁর প্রশংসা করেন তাদের চেয়ে মহান আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ হওয়া সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা 'মোহাম্মদ' ও 'আহমদ' উভয় শব্দ একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একজন আদর্শ লোকের জীবনের কিংবা মানব জীবনের যতোগুলো দিক ও ক্ষেত্র আছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। উম্মতে মোহাম্মদীর স্বীয় কথায় ও কাজে তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

দশ ঃ আল (آلُ) শব্দের বুৎপত্তি ও আহ্কাম

آلُ (আল) শব্দটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে দু'ধরনের কথা আছে।

(১) آلٌ শব্দটির মূল হলো أَهْلٌ পরবর্তীতে "هـ" অক্ষরটি "ء" হামযায় রূপান্তরিত হয়ে "أَأْلٌ" হয়। পরিশেষে "ء" হামযা অক্ষরটি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে "ا" খাড়া যবর বা মদে রূপান্তরিত হয়ে "آلٌ" এ পরিণত হয়। শব্দটিকে تَصْغِيْر এ প্রকাশ করতে চাইলে মূল শব্দ ফিরিয়ে আনতে হয় এবং এর রূপ হয় "أُهَيْلٌ"

"آلٌ" শব্দটি স্থান কাল কিংবা জাতি– প্রজাতির সাথে সম্পৃক্ত হয় না। যেমন– একথা বলা ঠিক নয় যে 'আলে রাজুল' (آلُ رَجُلٍ) পুরুষ জাতির আহল। আলে ইমরাতুন (آلِ اِمْرَأَةٍ) স্ত্রীজাতির আহল। বংশীয় শাখা-প্রশাখাগত ব্যাপারে বংশীয় কোনো বিশিষ্ট ও সম্মানিত নামের সাথে শব্দটি সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। যেমন– বলা হয়ে থাকে 'আলে ইমরান' (آلُ عِمْرَانَ) আলে ইব্রাহীম (آلُ اِبْرَاهِيْمَ)।

(২) কারো মতে, "آلٌ" শব্দটির মূলধাতু হলো أَوْلٌ 'সিহাহ্' এর প্রণেতা একথা বলেছেন। এরূপ মৌলিক অর্থবোধক হলে "آلُ" শব্দটি জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে آلُ الرَّجُلِ হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে– ব্যক্তির পরিবার পরিজন কিংবা তার অনুসরণীয়গণ।

"آلٌ" শব্দটির উৎপত্তিস্থল যদি হয় آلَ يَؤُوْلُ ফিরে আসা অর্থে, তাহলে آلُ الرَّجُلِ এর অর্থ দাঁড়াবে, যারা ঐ ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যারা তার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং যারা ঐ ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বানাবে।

কারো মতে, "آلٌ" শব্দটির "اَلْأَوَّلُ" শব্দ থেকে নির্গত। শব্দটির অর্থ প্রথম বা একক। বস্তুতঃ সংখ্যার ভিত্তি ও মূল হলো এই একক বা প্রথম সংখ্যা। প্রথম সংখ্যা থেকে অবশিষ্ট শত শত সংখ্যার উৎপত্তি। এক বা প্রথমকে বাদ দিয়ে কোন সংখ্যার অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। সুতরাং آلُ الرَّجُلِ বাক্যের অর্থ হবে– প্রথম বা মূল ব্যক্তির ধারা।

"آلُ" শব্দটির অর্থ ঃ (ক) স্বয়ং ব্যক্তি (খ) ব্যক্তিকে যারা অনুসরণ করে (গ) বংশ ও আত্মীয়-স্বজন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে প্রথম অর্থের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সদকাসহ আগত হযরত আবু আওফা (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى এখানে اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى বলতে স্বয়ং আবু আওফাকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণী– سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْن 'আলে ইয়াসীনের উপর সালাম।' (সাফফাত ঃ ১৩০) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ....

এ হাদীসে اٰلِ اِبْرَاهِيْم বলতে খোদ ইব্রাহীম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এবং اِلْ يَاسِيْن বলতে ইয়াসিন (আঃ) বুঝানো হয়েছে।

অন্যান্য চিন্তাবিদগণ বলেছেন– اَلْاٰلُ শব্দটি "অনুসরণকারী" (اَلْاِتِّبَاعُ) এবং আত্মীয়-স্বজনগণ (اَلْاَقَارِبُ) শব্দদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে যে اٰلْ শব্দের ব্যবহার হয়েছে তদ্বারা যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অনুসরণকারী ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এ বাক্যের اٰلِ اِبْرَاهِيْم অর্থ সমস্ত নবীগণ উদ্দেশ্য। সমস্ত নবীগণসহ ইব্রাহীম (আঃ) সন্তানগণের উপর যেভাবে রহমত নাযিল করা হয়েছে, সেভাবে যেনো নবী আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল হয়। এখানে কেবলমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) উদ্দেশ্য নয়।

سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْن আয়াতে اِلْ يَاسِيْن বলতে 'ইয়াসীন' হওয়ার ব্যাপারে দু'টি মত আছে। একটি মতে, اِلْ يَاسِيْن একটি শব্দ, অপর মতে

اِلْ يَاسِيْس দু'টি শব্দ। সুতরাং এক শব্দ হলে ইয়াসীনের বংশ বা পরিবার-পরিজন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

"اَلْاٰلُ" শব্দটি যদি একক হয় তাহলে শব্দটির সাথে সম্পৃক্ত শব্দ (مُضَافٌ اِلَيْهِ) এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন কুরআনে আছে–

اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ *

'ফেরাউনের অনুসারীদেরকে ভয়ানক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করুন।'
(গাফের ঃ ৪৬)

অপর আয়াতে আছে– وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ *

এবং আমরা ফেরাউনের অনুসারীদেরকে পাকড়াও করেছি কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে... (আরাফ ঃ ১৩০)

আয়াতদ্বয়ে اٰلْ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত শব্দ فِرْعَوْن শব্দটি আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এমনিভাবে রাসূলের বাণীর صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ এবং اٰلُ اَبِىْ أَوْفٰى এবং كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এসব বাক্যের 'আবু আওফা' 'মোহাম্মদ' ইব্রাহীম শব্দগুলো اٰلْ শব্দের অন্তর্গত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

অবশ্য যদি اٰلْ শব্দের পূর্বে ব্যক্তির উল্লেখ থাকে, তারপর اٰلُهٗ শব্দের ব্যবহার হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শব্দটির একক ও সংমিশ্রন (مُجَرَّدْ وَمَقْرُوْنْ) ব্যবহারের উপর সম্পৃক্ত শব্দটির অন্তর্ভুক্তি হওয়া না হওয়া নির্ভর করবে। যেমন বলা হলো- اَعْطِ لِزَيْدٍ وَاٰلِ زَيْدٍ অর্থাৎ যায়েদকে দাও এবং যায়েদের বংশধরদেরকে দাও। এ ক্ষেত্রে اٰلِ زَيْد এর মধ্যে যায়েদ অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি বলা হয় اَعْطِهٗ لِاٰلِ زَيْدٍ যায়েদের আলকে দাও। এ ক্ষেত্রে দেওয়ার নির্দেশের মধ্যে যায়েদ ও তার বংশ আত্মীয় বা অনুসরণকারীগণ শামিল হবে।

এগার ঃ নবী আলাইহিস সালামের 'আল' (বংশ) এর পরিচয়

'মোহাম্মাদ' মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আল) বংশ বা আত্মীয় সম্পর্কে ৪টি অভিমত পাওয়া যায় ঃ

(১) যাদের জন্যে সদকাহ, দান-খয়রাত, অনুদান হারাম করা হয়েছে তারাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। এ ব্যাপারে ও আলেমগণের ৩টি মত পরিদৃষ্ট হয়। (ক) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমদ (রঃ) প্রমুখ বলেছেন, তারা হচ্ছেন বনী হাশেম এবং বনী আবদুল মোতালিব।

(খ) ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদের (রঃ)-এর অপর মতানুযায়ী শুধুমাত্র বনী হাশেম হলো 'আলে মোহাম্মদ। ইমাম মালেকের (রঃ)-এর অনুসারী ইবনুল কাশেম এ মতটি সমর্থন করেছেন।

(গ) ইমাম মালেকের (রঃ) শিষ্যগণের মধ্যে 'আশহাব' এবং اَلْجَوَاهِرْ গ্রন্থ প্রণেতা এবং (تَبْصِرَةْ) তাবসিরায় বর্ণিত আল লাখমীর মতে, আলে মোহাম্মদ হলো, বনী হাশেম থেকে আরম্ভ করে উর্ধ্বতন বনী গালিব পর্যন্ত। বনি মোতালিব, বনি উমাইয়াহ, বনি নাওফিল, বনি গালিব এসকল গোত্রসমূহ বনি হাশেমের অন্তর্গত।

(২) আলে মোহাম্মদ হচ্ছেন তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর বিবিগণ (هُمْ ذُرِّيَّتُهُ وَاَزْوَاجُهُ) ইবনে আবদুল বার (اَلتَّمْهِيْدُ) গ্রন্থে আবু হুমাইদ আসআদীর হাদীসের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। কতিপয় আলেম (اٰلِ مُحَمَّدٍ) হাদীসের এ অংশ দ্বারা (هُمْ ذُرِّيَّتُهُ وَاَزْوَاجُهُ) আলে মোহাম্মাদ বলতে তাঁর সন্তান ও বিবিগণ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন–

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ"

এ হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো আবু হোমাইদের বর্ণিত হাদীস'। হাদীসটি হলো اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ অর্থাৎ আয়

আল্লাহ্! তুমি রহমত বর্ষণ কর মোহাম্মদ এবং তার সন্তান-সন্ততি ও তাঁর বিবিগণের উপর।"

اَلْآلُ এবং اَلْاَهْلُ শব্দদ্বয় সমভাবাপন্ন। আল ও আহল হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান এবং বিবিগণ। প্রায় সকল ইমামগণের মতে এরূপ দোয়া করা জায়েয।

(৩) 'আলে মোহাম্মাদ' হচ্ছেন কিয়ামত অবধি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণকারীগণ। এ মতের সমর্থনকারীগণ হচ্ছেন–

ইবনে আবদুল বার। তিনি বিজ্ঞ লোকদের উদ্ধৃতিসহ একথা বলেছেন। যায়েদ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে। বায়হাকী তাঁর থেকে এগুলোর উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী (রঃ) তার থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালেকের (রঃ) কতিপয় শাগরিদ একথার সমর্থন দিয়েছেন। আবু তাইয়েব তাবারী তার تَعْلِيْق গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী (রঃ) 'শরহে মুসলিম' এ একথার গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আল আযহারী একথা গ্রহণ ও সমর্থন করেছেন।

(৪) 'আলে মোহাম্মদ' হচ্ছেন নবী আলাইহিস সালামের উম্মতগণের মধ্যে যারা মোত্তাকী, পরহেজগার, আল্লাহভীরু তারা। যাঁদের হৃদয় আল্লাহর ভয় ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব ও অকৃত্রিম প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসায় আপ্লুত তারাই হচ্ছেন আলে রাসূল। এ মত পোষণ করেছেন কাযী হোসাইন, রাগিব এবং একদল বিশেষ আলেম।

বার ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ (أَزْوَاجٌ)

উপরে বলা হয়েছে যে, দুরূদে পঠিত (آلٌ) শব্দটির দ্বারা (أَزْوَاجُهُ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ উদ্দেশ্য। এবার তাঁর বিবিগণের বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

(১) খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ (রাঃ) ঃ উর্ধ্বতন বংশ ও পিতৃ পরিচয়ে তাঁর নাম ছিল খাদীজাহ্ বিন্তু খুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল ওজ্জা বিন কুসাই বিন কিলাব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৫ বৎসর বয়স কালে তাঁকে বিবাহ করেন। তখন খাদীজার (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের ৩ বৎসর মতান্তরে ৪/৫ আগে খাদীজাহ্ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। চরম দুর্দিনে তিনি ছিলেন রাসূলের জীবন সঙ্গীনি, সাহায্যকারী, পরামর্শদাতা, এবং সান্তনা দানকারী। ৬৫ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন।

তাঁর মর্যাদা ঃ

* তাঁর জীবিতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করেননি।

* নবী তনয় একমাত্র ইব্রাহীম ছাড়া আর সব ছেলে-মেয়ে খাদীজার (রঃ) ঔরসে জন্মলাভ করেন। ইব্রাহীম (রাঃ) মারীয়ার (রাঃ) ঔরসে জন্ম নেন।

* উম্মতে মোহাম্মাদীর তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ নারী।

* আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফতে হযরত খাদীজার (রাঃ) কাছে 'সালাম' পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'সালাম' পৌছে দেন।

* হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْطَعَامٌ أَوْشَرَابٌ ـ

فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي - وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ *

জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! খাদীজাহ (রাঃ) আপনার কাছে পাত্রভর্তি কিছু খাদ্য নিয়ে আসতেছেন। তিনি আসলে তাঁর রব এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে এমন মনিমুক্তা খচিত জান্নাতের শুভসংবাদ দিবেন যেখানে সুখ আর সুখ। অসুস্থ ও অশান্তির লেশ মাত্র নেই।" (বুখারী, মুসলিম ঃ ১৪৬৩)

* তিনি ছিলেন প্রথমা ঈমানদার মহিলা সাহাবী, প্রথমা উম্মুল মুমিনীন, প্রথমা গর্ভধারিনী মুমিনীন জননী।

(২) সাওদাহ বিনতে যামআ (রাঃ) ঃ

হযরত খাদীজা (রাঃ) মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাওদাহ্ বিনতে যামআকে (রাঃ) বিবাহ করেন। খাদীজার (রাঃ) মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষন্ন হয়ে পড়েন। মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও সাংসারিক কাজ-কর্ম গুছানোর কাজ করা দুরূহ হয়ে উঠে। এ অবস্থা দর্শনে ইবনে মাযউনের স্ত্রী খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকীম সাকরান ইবনে আমরের (রাঃ) বিধবা স্ত্রী সাওদাহকে (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। পিতা -মাতা মেয়ে সাওদাহকে (রাঃ) ৪শ দিরহাম মহরানার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিয়ে দেন।

সাওদাহ (রাঃ) ছিলেন দীর্ঘদেহী। রাগ একটু বেশি হওয়ার দরূণ মেজাজ একটু কড়া থাকলেও উদারতা ও দানশীলতায় তা ঢাকা পড়ে যায়। তিনি গরীবদেরকে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। খাদ্য টাকা-পয়সা কখনো তিনি জমা করতেন না। তাঁর মধ্যে হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার লেশমাত্র ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহের পর তার ঔরশে কোনো সন্তান হয়নি। সাকরানের (রাঃ) ঔরশজাত একটি পুত্র সন্তান ছিল। নাম ছিল আবদুর রহমান (রাঃ)। তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) শাসনামলে জালুলার যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদত বরণ করেন। ২য় খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) শাসনামলের শেষদিকে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(৩) হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ঃ

হযরত আবুবকরের (রাঃ) কন্যা হযরত আয়েশার (রাঃ) মায়ের নাম ছিল উম্মে রুম্মান। চরম বর্বরতার পরিবেশেও আবু বকরের (রাঃ) পরিবার ছিল জাহিলিয়াত মুক্ত, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। এ পরিবেশেই লালিত হয়েছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ)।

৬ বৎসর বয়সকালে নবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের ৩ বৎসর পর তিনি মদিনায় হিযরত করেন। পিতা আবুবকর (রাঃ) মেয়েকে নবীর সাথে বিবাহ দিতে সক্ষম হওয়ায় খুবই তৃপ্ত হোন। এ সম্পর্ক ছিল তার জন্যে একটি গৌরব ও মর্যাদার ব্যাপার।

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র কুমারী পত্নি। অন্যান্য সকলেই ছিলেন বিধবা।

(খ) তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। ইফক বা মিথ্যা অপবাদের কাহিনী একথার স্বাক্ষর।

(গ) তাঁর ঘরে আবস্থানকালে রাসূলের কাছে ওহী আসতো। অন্য বিবিদের বেলায় এরূপ হতো না।

(ঘ) তাঁর কোলেই রাসূলের ওফাত হয়।

(ঙ) তাঁর গৃহেই রাসূলের দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। মদীনায় আজকের রওজা মুবারক হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহ ছিল।

(চ) রাসূলের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল স্বাপ্নিক নির্দেশে।

ইফকের ঘটনা, তাহরীমের ব্যাপার এবং তাখয়ীরের প্রসঙ্গে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত অমর করে রাখবে।

তাঁর স্বভাব প্রকৃতি ঃ

অতিথি পরায়ণতা, দানশীলতা ও দরিদ্র সেবায় তিনি ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। রাসূলের অনুপস্থিতিতে বনু শফক গোত্রের প্রতিনিধি দলের মেহমানদারী করার ঘটনা ছিল তাঁর অতিথি পরায়ণতার স্বাক্ষর। এমানিভাবে তাঁর কাছে আসা ৭০ হাজার দিরহাম এক নাগাড়ে গরীবের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তিনি দানশীলতার নজীর স্থাপন করেন। ইফতারের পূর্ব মূহুর্তে মিসকীনের হাঁকে ঘরে থাকা সমুদয় খাদ্য তাকে দান করে দরিদ্র সেবার

পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বোনের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের খালাম্মার এরূপ বদান্যতায় ও উদারতায় বিরক্ত হওয়ার খবর পেলে তিনি ভাগীনের সাথে কথা না বলার কসম করেন। পরে তিনি ৪০টি গোলাম আযাদ করে এ কসম ভংগ করে ভাগিনার সাথে কথা বলেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অবদান ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর মেধা ছিল তীক্ষ্ণ, বুদ্ধি ছিল প্রখর। কুরআনে করিমের অনেক আয়াতের তিনি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি হাদীসে কুরআন সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞানের কথা প্রমাণিত হয়।

মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন– আয়েশা (রাঃ) বলেছেন– এমন তিনটি কথা আছে যা বললে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করা বুঝায়। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলা। কেননা কুরআনে আছে–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ - اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ -

"কোনো মানুষের জন্যে এটা সম্ভব নয় যে, অহী অথবা পর্দার আড়াল কিংবা আল্লাহরই কোনো প্রেরিত দূত– যে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওহী নিয়ে আসবে, এ ছাড়া আল্লাহ্ অন্য কারো সাথে কথা বলবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহান ও বিজ্ঞ।" (সূরা শুরা ঃ ৫১)

উপরোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন– এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে আমিই সর্বপ্রথম নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমি যাকে দেখেছি তিনি ছিলেন জিব্রাইল (আঃ)। আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দুবার দেখেছি। আয়াতটি হলো–

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى *

"নিশ্চয়ই সে সমুজ্জ্বল দিগন্তে তাকে দেখেছে এবং নিশ্চয়ই সে আর একবার তাকে প্রত্যক্ষ করেছে।" (নাজম ঃ ১৩, ১৫)

দ্বিতীয় কথা হলো, যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্‌র রাসূল কোনো কিছু গোপন করেছেন। এরূপ ধারণা পোষণ করা আল্লাহ্‌র উপর দোষ আরোপ করার নামান্তর। কারণ আল্লাহ বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ *

"হে রাসূল! আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সবটুকুই মানুষের কাছে পৌছে দিন। আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহলে আল্লাহর রিসালাত আপনি পৌছে দিতে পারলেন না।"

(মায়িদা ঃ ৬৭)

আগামীকাল কিছু হওয়ার আগাম কথা জানা থাকার ধারণা পোষণ করা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের তৃতীয় কথা। কারণ কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ *

"হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান-যমীনের কেহই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।" (নামল ঃ ৬৫)

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে তাঁর অবদান ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) দীর্ঘ ৩৯ বছর বেঁচে ছিলেন। ফলে তিনি অনেক হাদীস সংরক্ষণ সংকলন করার সুযোগ পান। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত ও সংগ্রহ করেন।

ইমাম যুহরী (রঃ) লিখেছেন–

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَعِلْمُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْسَعُهُمْ عِلْمًا *

"সকল মানুষের এবং উম্মুল মুমিনীনের সকল ইলম যদি একত্র করা হয়, তাহলে হযরত আয়েশার (রাঃ) ইলম হবে তাদের চেয়ে বেশি।"

হাদীস বর্ণনা করার সংখ্যার দিক থেকে প্রথম ছিলেন হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাঃ)। ২য় ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

তৃতীয় স্থান ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-র। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ২২১০টি। ১৭৪ টি হাদীস আছে বুখারী, মুসলিমে। আলাদাভাবে বুখারীতে আছে ৫৪টি এবং মুসলিম শরিফে আছে ৫৮টি।

শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকরের (রাঃ) আদরের দুলারী সাইয়্যেদুল মুরসালীন শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাগ্যবতী পত্নী বিশ্বখ্যাত মু'মেনীন জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ (রাঃ) ৫৭ মতান্তরে ৫৮ হিজরী সনের ১৭ই রমযান মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ৬৭ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তৎকালীন সময়ে অন্য কারো জানাযায় এতো লোকের সমাগম হয়নি।

(৪) হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ) ঃ

মুসলিম জাহানের ২য় খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) কন্যা হাফসা (রাঃ) ছিলেন উম্মুল মুমিনীনদের একজন। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন খুনাইস (রাঃ)। ওহুদের যুদ্ধে বীর বিক্রমের মতো লড়াই করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এই আহতের কারণে তিনি কয়েকদিন পর ইহধাম ত্যাগ করেন।

হাফসা (রাঃ) বিধবা হলে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে পুনরায় বিবাহ দেয়ার চিন্তা করেন। এ সুবাদে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ)-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করার মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে কন্যা হাফসাকে (রাঃ) বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। তাঁরা অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি মনঃক্ষুন্ন হয়ে রাসূলের দরবারে গিয়ে মনের কথা খুলে বললেন। ওমরের (রাঃ) সব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাফসার (রাঃ) বিয়ে আবু বকর (রাঃ) এবং ওসমানের (রাঃ) উভয় থেকে উত্তম ব্যক্তির সংগে হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। এদিকে ওসমানের (রাঃ) স্ত্রী রাসূল তনয়া রোকাইয়াহ্ (রাঃ) ইন্তেকাল করলে রাসূলের তনয় ২য় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে (রাঃ) হযরত ওসমানের (রাঃ) সাথে বিয়ে দেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে, হযরত হাফসাহ (রাঃ)-এর মেজাজ কিছুটা কড়া ছিল এবং মাঝে মধ্যে চড়া ভাষায় নবীর সাথে কথা বলতেন। একথা

শুনার পর হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যাকে ধমকের সুরে বললেন– হে হাফসাহ! সাবধান! আমি তোমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছি। আয়েশার (রাঃ) সমকক্ষ হতে চেষ্টা কর।

তিনি ছিলেন আল্লাহ্ ভীরু। বেশীর ভাগ সময় ইবাদতে কাটাতেন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হাফসাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন– সে খুব ইবাদতকারী, রোযাদার। তিনি জান্নাতেও আপনার স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যবতী হবেন। হিজরী ৪৫ সনের শাবান মাসে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

(৫) হযরত যয়নব বিনতে খোযাইমাহ (রাঃ) ঃ

ওহুদের প্রান্তরে শাহাদত বরণকারী উঁচু দরজার সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের (রাঃ) সাথে যয়নব বিনতে খোযাইমার (রাঃ) প্রথম বিবাহ হয়। আবদুল্লাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন এভাবে–

'হে আল্লাহ! আমাকেএমন বাহাদুর শত্রুর মুকাবিলা কর যার সাথে আমি যুদ্ধ করবো অত্যন্ত তীব্র গতিতে। আমি যুদ্ধে শহীদ হলে সে রাগে রোষে আমার নাক, কান ঠোঁট কেটে ফেলবে। আর আমি এ অবস্থাতেই হাশরের মাঠে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার এ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি আরজ করবো, তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্যে। বস্তুতঃ তাকে এ অবস্থাতেই যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায়।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের (রাঃ) শাহাদতের পর ঐ বৎসরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধবা যয়নবকে(রাঃ) ৫ দিরহাম মহরানা ধার্য করে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বসর। বিবাহের ২/৩ মাসের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকীতে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

ফকীর-মিসকীন অভাবগ্রস্তদেরকে উদারহস্তে দান করতেন বলে তিনি উম্মুল মাসাকীন বা গরীবের জননী রূপে খ্যাত ছিলেন।

(৬) হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) ঃ

আবু উমাইয়ার কন্যা নবীপত্নি হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) ছিলেন কুরাইশের বনী মাখযুম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। মাতা ছিলেন আতিকা বিনতে আমের (রাঃ)।

উম্মে সালমার (রাঃ) ১ম বিয়ে হয় আপন চাচাতো ভাই আবদুল্লাহর সাথে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হাবশায় হিজরত করেছিলেন। বদর ও ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অংশগ্রহণ করেন। ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি শহীদ হন।

স্বামীর শহীদ হওয়ার পর তাঁর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি অমত প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর ফারুকের (রাঃ) মারফতে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি সম্মত হোন। ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে বিবাহ হয়।

উম্মে সালমাহ (রাঃ) ছিলেন সাহিত্যিক, বাকপটু, তীক্ষ্ম মেধার অধিকারিণী। ৮৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) তাঁর সালাতুল জানাযায় ইমামতি করেন।

(৭) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ঃ

হযরত যয়নবের (রাঃ) পিতা ছিলেন জাহাশ বিন রিয়াব। আর মাতা ছিলেন উমাইয়া বিনতে আবদুল মোত্তালিব। তাঁর ১ম বিবাহ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারিসের (রাঃ) সাথে। নবীর নির্দেশে বিবাহ সম্পন্ন হলেও অসমতা ও গোত্রীয় কৈলন্যবোধের কারণে বিবাহ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। যায়েদ (রাঃ) তাঁকে তালাক দেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনঃক্ষুন্ন তালাক প্রাপ্তা যয়নবকে (রাঃ) বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি (ক) হযরত যয়নবের (রাঃ) ক্ষোভ ও ক্ষেদের অবসান (খ) দত্তক পুত্র ঔরশজাত পুত্র হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা নিরসন।

সেকালে পালক পুত্রকে আপন পুত্র মনে করা হতো। এটা ছিল কাহিনী ও ভ্রান্ত ধারণা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালক পুত্রের তালাক

প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে এ ধারণা বিলোপ করেন। কেননা আপন পুত্র হলে তাঁকে বিবাহ করা জায়েজ হতো না। এ পর্যায়ে আয়াত নাযিল হয়–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ *

"তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ـ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا *

"অতঃপর যায়েদ যখন তার কাছ যায় না থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল, তখন আমি তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। যাতে প্রয়োজন পূরণ করার পর মুখ ডাকা পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের উপর কোনো দোষারোপ করা না চলে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তো পূর্ণ হবেই। (আহযাব ঃ ৩৭)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে ২০ হিজরী সনে ৫৩ বৎসর বয়স কালে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সালাতুল জানাযায় ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকিতে তিনি শুয়ে আছেন। ১১টি হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।

(৮) হযরত যুবাইরিয়াহ বিনতে হারিস (রাঃ) ঃ

নবীপত্নী যুবাইরিয়াহর (রাঃ) নাম ছিল বারা। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নাম পরিবর্তন করে রাখেন যুবাইরিয়াহ। তিনি গোত্র নেতার কন্যা ছিলেন। ৫ হিজরী সনে বনু মোস্তালিক যুদ্ধে গনীমতের মাল হিসেবে বন্দী হয়ে নীত হন। বন্টনে তিনি সাবিত বিন কয়েসের ভাগে পড়েন। দাসত্ব জীবন ছিল তাঁর জন্যে অপমানজনক। তাই তিনি মুদ্রার বিনিময়ে মুক্ত হতে চাইলেন। রাসূল তাঁকে ক্রয় করতঃ মুক্ত করে দেন এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

এদিকে যুবাইরিয়ার (রাঃ) গোত্র নেতা বারা কন্যার বন্দী হওয়ার কথা শুনে কয়েকটি উট বোঝাই সম্পদ নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হোন। কন্যা নবী পত্নি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং পথিমধ্যে নবীর আশ্চর্যজনক ঘটনায় অভিভূত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কন্যাকে দেখে খুশি মনে গৃহে ফিরে যান।

হযরত যুবাইরিয়াহ (রাঃ) লাজুক প্রকৃতির ও সুন্দর আকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। দৈহিক গড়ন ছিল চমৎকার, স্বভাব ছিল নমনীয়। চেহারা ছিল শ্রদ্ধা মিশ্রিত কান্তিময়। অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন। হিজরী ৫০ সনে ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদীনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর সালাতুল জানাযায় ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকিতে তিনি চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন।

(৯) হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) ঃ

আবু সুফিয়ানের (রাঃ) কন্যা উম্মে হাবীবাহ্র (রাঃ) আসল নাম 'রামলা'। তবে তিনি 'উম্মে হাবীবাহ' উপনামে খ্যাত ছিলেন।

উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) প্রথমতঃ যয়নব বিনতে জাহাশের (রাঃ) ভাই ওবায়দুল্লাহর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হোন। তারা উভয়েই হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তিতে ওবায়দুল্লাহ ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান হয়ে যায়। ফলে স্বামীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উম্মে হাবীবাহর (রাঃ) নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। ৪শ দিনার মহরানা ধার্য করে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়।

তিনি খুব নরম স্বভাবের লোক হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী চেতনায় ছিলেন প্রদীপ্ত। পিতা আবু সুফিয়ানকে ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত রাসূলের বিছানায় বসার সময় বিছানা উল্টে দিতেন। কারণটা তিনি নিজেই বললেন ঃ একজন মুশরিকের (স্বীয় পিতা) নবীর বিছানায় বসা আমি পছন্দ করি না। ঈমানী চেতনায় তেজোদীপ্ত একটি হৃদয় থেকে এরূপ কথারই বহিপ্রকাশ ঘটে থাকে। হিজরী ৫৪ সালে ৭৩ বৎসর বয়স কালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

(১০) হযরত সাফিয়াহ বিনতে হুইয়াহ (রাঃ) ঃ

সাফিয়াহর পিতা ছিলেন হুইয়াহ বিন আখতাব। পিতা ও দাদা ইহুদী সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। খায়বার যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে ইহুদী ও মুশরিকগণ পরাজিত হলে অন্যান্যদের ন্যায় হযরত সাফিয়াহ বন্দী হোন। এ যুদ্ধে তার পূর্ব স্বামী কিনান বিন অকাল নিহত হয়।

যুদ্ধলব্ধ মালামাল বণ্টনের সময় দাহিয়া কালবী (রাঃ) একজন দাসীর প্রয়োজনীয়তার কথা রাসূলের কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তার পছন্দ মতো একজনকে বেছে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। দাহিয়া (রাঃ) সাফিয়াকে পছন্দ করেন। সাফিয়াহ (রাঃ) কৌলিন্য ও মর্যাদার দিক থেকে দাহিয়ার (রাঃ) সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার কথা উপস্থিত সাহাবাগণ ব্যক্ত করলেন এবং তাঁকে খোদ রাসূলের জন্যই মানানসই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সাহাবাগণের পরামর্শের ভিত্তিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, মর্যাদাবান ও ধৈর্য্যশীলা। ৬০ বৎসর বয়সে ৫০ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

(১১) হযরত মাইমুনাহ বিনতে হারিস (রাঃ) ঃ

হযরত মাইমুনাহ (রাঃ) ছিলেন হারিস বিন হামযার কন্যা। তাঁর ১ম বিবাহ হয় মাসউদ বিন আমরের সাথে। কোন কারণে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ২য় বিবাহ হয় আবু রেহেমের সাথে। ৭ম হিজরী সনে ২য় স্বামীর মৃত্যু হয়।

৭ম হিজরীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হোন। এ সময় চাচা আব্বাসের (রাঃ) অনুরোধক্রমে তিনি মাইমুনাকে বিবাহ করেন। এটাই ছিল রাসূলের শেষ বিবাহ।

তিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে ছিলেন খুবই হুশিয়ার। এ ব্যাপারে তিনি কখনো কাউকে ছাড় দিতেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তিনি সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন।

৫১ হিজরী সনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। যে স্থানে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তের ঃ (ذُرِّيَّةٌ) শব্দের তাৎপর্য ও রাসূলের সন্তানদের পরিচয়

ذُرِّيَّةٌ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি আছে। শব্দটির মূলশব্দ হলো ذُرِّيْئَةٌ শেষ অক্ষরে ব্যবহৃত "ء" (হামযাহ) অক্ষরটি কাঠিন্যের কারণে রহিত হয়ে যায়। ফলে শব্দটি ذُرِّيَّةٌ তে রূপান্তরিত হয়। ذُرِّيَّةٌ শব্দটি ذَرْأٌ অর্থে প্রযোজ্য। ذَرْأٌ অর্থ ছড়ানো-ছিটানো। যেমন– বলা হয় ذَرَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি জীবকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন কিংবা প্রকাশ করেছেন। ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, ذُرِّيَّةٌ শব্দটি ছোট বড় সব ধরনের সন্তান-সন্তুতিদের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কুরআনে আছে–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ *

অর্থাৎ যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি সেগুলো সম্পন্ন করলে আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে লোকগণের ইমাম (নেতা) বানালাম। ইব্রাহীম (আঃ) বললেন ঃ আমার আওলাদ ফরবন্দ থেকেও ...... (বাকারাহ ১ঃ ২৪)

সূরায়ে আলে ইমরানের ৩৩-৩৪ আয়াতে আছে–

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ : ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ*

সূরায়ে আনআমের ৮৭নং আয়াতে আছে–

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

সূরায়ে ইসরার ২ ও ৩ আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন-

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ لَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا *

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে ذُرِّيَّةٌ শব্দ দ্বারা সন্তান-সন্ততি আওলাদ ফরযন্দকে বুঝানো হয়েছে।

ذُرِّيَّةٌ শব্দটি اٰبَاءُ (বাপ-দাদা) এর অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা এনিয়ে মতানৈক্য আছে। কিছু লোক বলছেন, ذُرِّيَّةٌ শব্দটি اٰبَاءُ শব্দের অর্থে অর্থাৎ বাপ-দাদার অর্থে প্রয়োগ হতে পারে।

ভাষাবিদগণের একদল লোক বলেন- এরূপ ভাবার্থ প্রয়োগ করা ঠিক নয়। ذُرِّيَّةٌ শব্দটি মূলতঃ বংশ, সন্তান এবং পশ্চাতে আগমনকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি ذُرِّيَّةٌ শব্দটির দ্বারা اٰبَاءُ বুঝা যেতো তাহলে কুরআনের বাণীতে ... وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ভিন্নভাবে اٰبَاءُ ও ذُرِّيَّةٌ শব্দের প্রয়োগ হতো না।

কারো মতে, নসবনামা বা বংশ তালিকার উর্ধ্বতন তিন পুরুষ এবং অধঃস্তন তিন পুরুষ পর্যন্ত ذُرِّيَّةٌ এর মধ্যে গণ্য।

ذُرِّيَّةٌ শব্দটি দ্বারা اَوْلَادُ اَوْلَادِهِمْ ছেলে সন্তান ও তদীয় ছেলে সন্তান হওয়ায় মেয়ে সন্তানের সন্তান ذُرِّيَّةٌ এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এনিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন- মেয়ে সন্তান ও ذُرِّيَّةٌ এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন- মেয়ে সন্তানের সন্তান ذُرِّيَّةٌ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

চৌদ্দ ঃ ইব্রাহীম এবং আলে ইব্রাহীমের তাৎপর্য

উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে নির্দেশিত দুরূদে আমরা দেখতে পাই, ইব্রাহীম এবং আলে ইব্রাহীমের উল্লেখ আছে এভাবে–

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ *

অতএব ইব্রাহীম এবং আলে ইব্রাহীম সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। اِبْرَاهِيْم শব্দটি সুরইয়ানী ভাষা। শব্দটির অর্থ اَبٌ رَحِيْمٌ মহান আল্লাহ্ তাঁকে সারা বিশ্বের তৃতীয় পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১ম পিতা হচ্ছেন আদম (আঃ) এবং ২য় পিতা হচ্ছেন নূহ (আঃ)। সারাবিশ্বের মানবমণ্ডলী তাদের বংশোদ্ভুত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন–

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبَاقِيْنَ *

"এবং তাঁর বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম।" (সাফ্‌ফাতঃ৭৭)

যারা নূহ আলাইহিস্ সালামকে ও তাঁর বংশধরদেরকে চিনেনা কিংবা তুফানের ধ্বংসলীলার পর তাঁর বংশধরদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার কথা অস্বীকার করতে চায় অত্র আয়াতটি তাদের ধারণা অসাড় হওয়ার প্রমাণ।

ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম হচ্ছেন ৩য় পিতা। তিনি عَمُوْدُ الْعَالَمِ "বিশ্বের খুঁটি" اِمَامُ الْحُنَفَا "সত্যের অধিনায়ক" خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ "রহমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু" شَيْخُ الْاَنْبِيَاءِ "নবীগণের গুরু" ইত্যাকার উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্য কোনো নবীর মিল্লাত (দল, দ্বীন)-কে অনুসরণ করতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে কেবলমাত্র মিল্লাতে ইব্রাহীমকে অনুসরণ করার জন্যে। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

তাঁরপর আমি তাঁকে (মোহাম্মদ) এ কথার আহবান করলাম যে, ইব্রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ কর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, তিনি মুশরিক ছিলেন না।"

(নাহল ঃ ১২৩)

উম্মতে মোহাম্মদীকে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বললেন–

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - مِلَّةَ أَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ - هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ ....

তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এর আগেও ...... (হজ্জ ঃ ৭৮)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে উপদেশ দিয়ে বলতেন– তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় বল–

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ، وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ أَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

এই দোয়ায় فِطْرَةُ الْاِسْلَامِ، كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ এবং مِلَّةِ اِبْرَاهِيْم অর্থাৎ ইসলামের স্বাভাবিকতা, একনিষ্ঠ কালিমাহ্ এবং দ্বীনে ইব্রাহীমের কথা উল্লেখ রয়েছে। ফিৎরাতে ইসলাম বলতে আল্লাহ্ তায়ালা যে স্বাভাবিকতার উপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা বুঝায়। কালিমাতুল ইসলাম বলতে شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়া বুঝায়। আর মিল্লাতে ইব্রাহীম বলতে দ্বীনের ধারক-বাহক (صَاحِبُ الْمِلَّةِ) বুঝায়। বস্তুতঃ আমাদের নবী তথা সমগ্র নবীর দ্বীনের মূলতঃ একই আওয়াজ, এক উদ্দেশ্য ও অভিন্ন লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী সমস্ত নবী-রাসূলগণ আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তাঁর কোনো শরীক না থাকা, একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সর্বোপরি তাঁর আনুগত্য করা, মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া ইত্যাদির প্রতি ডাক দেয়া এবং বাস্তবায়ন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আল্লাহ্ তায়ালা সূরায়ে নাহলের ১২০-১২২ আয়াতে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আরো বলেছেন–

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا - وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ - وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ *

"নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, আল্লাহ্‌র জন্যে একনিষ্ঠ এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন নেয়ামতের শুকরগুজার ব্যক্তি। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেন এবং সহজ পথে পরিচালিত করেন। আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছি এবং তিনি আখিরাতে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

আয়াতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামকে 'উম্মত', 'ইমাম', 'ক্বানিত', হানীফ', 'শাকির', 'হাদী', 'সালিহ্' ইত্যাকার উপধীতে বিভূষিত করা হয়েছে। উম্মত শব্দের অর্থ দল, সম্প্রদায়। শব্দটি জাতির অনুসৃত নেতা, যাবতীয় গুণরাজির আঁধার। অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় এবং কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

قَانِتٌ 'ক্বানিত' শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম উভয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত একারণে যে, বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ একবাক্যে তাঁকে সম্মান করে। মুসলমান তো বটেই ইহুদী, খ্রীষ্টান, এমনকি মুশরিক ও অবিশ্বাসীগণও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রশংসা করে থাকে। নমরূদের আগুন পরীক্ষা, জন-মানবশূন্য অরণ্যে পরিবার-পরিজনকে একাকী ছেড়ে আসার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাংখার প্রতীক পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার নির্দেশ পালন এসব স্বাতন্ত্র গুণাবলীর কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা তাকে উপরোক্ত উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'খলীল' বা একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে সারা বিশ্বে খ্যাত ও পরিচিত হয়ে আছেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আমাদের জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذٰلِكَ اِبْرَاهِيْمُ *

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো– يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ 'হে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)"

(মুসলিম ঃ ২৩২৯, আবু দাউদ ঃ ৪৬৭২, তিরমিযি ঃ ৩৪৯)

বুখারী মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আছে– ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّكُمْ مُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ، ثُمَّ قَرَاءَ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ" وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ *

"তোমরা হাশরের মাঠে উলঙ্গ হয়ে উত্থিত হবে।" তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন।

তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছি সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। আমাকে তা পূরণ করতেই হবে।" কিয়ামত দিবসে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকেই সর্বপ্রথম কাপড় পড়ানো হবে।"

(বুখারী (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৪০ মুসলিম, ২৮৬০)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পৌত্র হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-দের জন্যে দোয়া করে বলতেন–

اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يَعُوْذُ بِهِمَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ *

তোমাদের বাবা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাকের (আঃ) জন্যে বলতেন ঃ আমি আল্লাহর পূর্ণ নামের উপর ভরসা করে সব ধরনের শয়তানী অনিষ্ট থেকে এবং সব ধরনের চোখ লাগা থেকে আশ্রয় চাই।"

(বুখারী [ফাতহুল] ঃ ৬/৩৩৭১)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন ১ম অতিথি (মানববেশী ফেরেশতা) আপ্যায়ণকারী, ১ম খৎনাকারী, ১ম বার্ধক্য দর্শনকারী। বার্ধেক্যের ছাপ দেখার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন– مَا هٰذَا يَارَبِّ؟ হে পরওয়ারদেগার তা কি? আল্লাহ্ বললেন– وَقَارٌ সম্মান, মর্যাদা। ইব্রাহীম (আঃ) বললেন– رَبِّ زِدْنِىْ وَقَارًا পরওয়ার দেগার! আমার ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দাও।"

আল্লাহ্ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন–

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا ـ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ فَرَاغَ اِلَى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ـ فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ *

"তোমার কাছে সম্মানিত মেহমানদের আগমণের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করলেন, তখন তিনিও সালাম পেশ করলেন। তাঁরা ছিলেন অপরিচিত। তারপর তিনি ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি মোটা বকরী মেহমানদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এসে পরিবেশন করলেন। তিনি বললেন, আপনারা আহার করছেন না কেন?"

(যারিয়াত ঃ২৪,২৭)

ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহ্ আরো বলেছেন–

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى *

"অথবা তাকে কি মুসার কিতাবে যা আছে সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি এবং ইব্রাহিমের কিতাবে, যিনি তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছিলেন।"

(নাজম ঃ ৩৬, ৩৭)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের উপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তিনি পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং যেসব পরীক্ষার মুখোমুখী হয়েছিলেন সেসব পরীক্ষায় তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আয়াতটি এ কথার স্পষ্ট দলিল।

তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

قَلْبُهُ لِلرَّحْمٰنِ وولَدُهُ لِلْقُرْبَانِ، وبَدنُهُ لِلنِّيْرَانِ ومَالُهُ لِلضَّيْفَانِ *

অর্থাৎ তাঁর হৃদয় ছিল রহমানের জন্যে, তাঁর ছেলে ছিল কুরবানীর জন্য, তাঁর দেহ ছিল আগুনের জন্যে এবং তাঁর ধন-সম্পদ ছিল অতিথিদের জন্যে নিবেদিত।

তিনিই তো বাইতুল্লাহ্ বানিয়েছেন, হজ্জের জন্যে দুনিয়াবাসীকে আহবান করেছেন। সেই শত সহস্র বৎসর আগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যারা হজ্জ করেন, ওমরা করেন তাদের সমপরিমাণ অতিরিক্ত নেকী তাঁর আমলনামায় জমা হচ্ছে। তাঁর পুণ্য স্মৃতি ও অমর কীর্তি অক্ষুন্ন ও অমর রাখার জন্যে আল্লাহ্ বললেন–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَّاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى *

"যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলিত স্থান ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানো জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও।" (বাকারাহ ঃ ১২৫)

ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের অবদান, বদান্যতা, আনুগত্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরো বললেন–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ *

"যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর, এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযক দান কর, আল্লাহ্ বলেন– যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকেও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দিব। অতঃপর তাদেরকে বল প্রয়োগে শাস্তিতে ঠেলে দিব, সেটা খুবই নিকৃষ্টস্থান।" (বাকারাহ ঃ ১২৬)

ইব্রাহীম আল্লাইহিস্ সালাম কাবা ঘরের ভিত্তি প্রস্তরের পর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন এভাবে–

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ـ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর করছিল। তখন তারা দোয়া করেছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর। আমাদেরকে হজ্জের নীতিসমূহ বলে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবাহ্ কবুলকারী। হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন। যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী কৌসুলী। (বাকারা ঃ ১২৭-১৩০)

মহান আল্লাহর উপরোক্ত বাণীসমূহে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের কাবা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা, অধিবাসীদের জীবিকার ব্যবস্থাপনা, শহরকে নিরাপদ রাখা, হজ্জের আহকাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পরবর্তী পর্যায়ে নবী প্রেরণ করার আবেদন, প্রেরিত নবীর কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ ফুটে উঠেছে। যে নবী নিজের সময়ের এবং পরবর্তীতে আগত উম্মতের দিক দর্শন সম্পর্কে একবার অবদান রাখেন তাঁকে স্মরণীয় ও বরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা খুবই যুক্তিসংগত। 'মাকামে ইব্রাহীম' 'সাফা-মারওয়ার সায়ী' মিনায় তথা সারাবিশ্বে পশু কোরবানী করার হাজার হাজার বছরব্যাপী ধর্মীয় প্রথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পুণ্য স্মৃতির বাস্তব নিদর্শন।

অপরদিকে আল্লাহ্র রাসূল স্বীয় প্রভুর নির্দেশে তাঁর উপর দুরূদ পাঠের সাথে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের সংশ্লিষ্ট করে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে স্মরণ ও বরণ করার প্রক্রিয়া তৈরি করেন যা যথার্থ ও পূর্ণাংগ সম্মান প্রদর্শনের মূর্ত প্রতীকরূপে গৃহীত ও স্বীকৃত।

পনের ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মোহাম্মদ"-এর অর্থ ও তাৎপর্য

اَلْبَرَكَةُ শব্দের মূল অর্থ দৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত, স্থির থাকা। কোনো বস্তু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বলা হয় فَقَدْ بَرَكَ উটের সংখ্যা বেশি হওয়াকে اَلْبَرْكُ বলা হয়। আবার اَلْبَرْكُ শব্দের অর্থ– জলাশয়।

অপরদিকে اَلْبَرَكَةُ শব্দের অর্থ হলো কল্যাণ, মংগল, প্রাচুর্য, বাড়ন্ত। اَلتَّبَرُّكُ শব্দের অর্থ বরকত বা কল্যাণ প্রাচুর্যের জন্যে দোয়া করা। যেমন– বলা হয়ে থাকে وَبَارَكَ لَهُ ـ وَبَارَكَ عَلَيْهِ ـ وَبَارَكَ فِيْهِ ـ بَارَكَهُ اللّٰهُ কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার আছে–

١. اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا *

٢. بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحَاقَ *

٣. بَارَكْنَا فِيْهَا *

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে بَارَكَ দ্বারা বরকত কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রাচুর্যতা বুঝানো হয়েছে।

হাদীসেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন একটি দোয়ায় লেখা আছে, وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ এবং সায়াদ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে আছে– بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থও কল্যাণ-বরকতের প্রাচুর্যতার জন্য কামনা করা বুঝানো হয়েছে। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ফাতহুল বারী)

আল্লাহ তায়ালার অপার বরকত ও কল্যাণে যাকে আপ্লুত করা হয়েছে তিনিই হলেন– اَلْمُبَارَكُ যেমন ঈসা (আঃ) বলেছেন–

وَجَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ *

'আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।" (মারয়াম ঃ ৩১)

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কিতাব আর কোরআন সম্পর্কে বলেছেন–

هٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ *

"এটি একটি বরকতময় উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি।" (আম্বিয়া ঃ ৫০)

আল-কোরআন সম্পর্কে আরো একটি আয়াত হলো–

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ *

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আপনার উপর বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি।" (সোয়াদ ঃ ২৯)

আল-কুরআনকে মুবারক বলা সবদিক থেকে যথার্থ হয়েছে। কেননা এ আল্লাহ্র কিতাব মানব –দানব পশু-পাখি, গাছ-তরুলতা-পাতা তথা সমগ্র সৃষ্ট জীবের জন্যে বরকত ও কল্যাণময়।

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ নিজের পরিচয়ে مُبَارَكٌ শব্দ ব্যবহার করেননি। বরঞ্চ তাঁর শানে ব্যবহৃত হয়েছে تَبَارَكَ যেমন বলা হয়েছে–

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ *

"বস্তুতঃ তোমাদের রব সে আল্লাহ্ যিনি আসমান যমিন ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। তারপর দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি চন্দ্র-সূর্য, তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন বিধানে বন্দী। সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁর। অপরিসীম বরকতশালী আল্লাহ্ সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী।" (আরাফ ঃ ৫৪)

সূরায়ে ফুরকানের ১ম আয়াতে আছে–

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا *

"বরকতময় তিনি যিনি কুরআন তার বান্দার উপর নাযিল করেছেন যাতে করে দুনিয়াবাসীকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে।" (ফুরকান ঃ ১)

সূরায়ে মুল্‌কে আছে–

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ *

"তিনি বরকতময় সে সত্ত্বা যার মুঠে সার্বভৌমত্ব। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।" (মুল্‌ক ঃ ২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফোরকানের নাযিল হওয়া, দুনিয়া সৃষ্টি করা, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হওয়া ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করতে তিনি تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, تَبَارَكَ এবং مُبَارَكٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে। مُبَارَكْ হচ্ছে যাকে বরকতময় করা হয়েছে। আর تَبَارَكَ হচ্ছে যিনি বরকতময় করার উৎস ও আঁধার। প্রতিটি কল্যাণ, বরকত, প্রাচুর্যতা আল্লাহ্‌র অধীনে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন কিংবা যার আমল আখলাক, কর্ম তৎপরতা আল্লাহর করুণা, দয়া, রহমত, কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী তাকেই মহান আল্লাহ কল্যাণের প্রাচুর্যতায় আপ্লুত করে 'মোবারক' করে তোলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে আবু সালেহ বলেছেন ঃ

تَبَارَكَ শব্দের অর্থ হচ্ছে تَعَالٰى অর্থাৎ সর্বোচ্চ, মহান, আবু আব্বাস বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের সমার্থক হচ্ছে اِرْتَفَعَ যার অর্থ উপরে উত্থিত, উন্নত, সমুচ্চ, উত্থাপিত। ইবনুল আনবারী বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের অর্থ হলো تَقَدَّسَ শব্দটির বাংলা তরজমা হলো পবিত্র হওয়া, উৎসর্গীকৃত হওয়া।

হাসান বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের অর্থ হলো تَجِيْئُ الْبَرَكَةُ مِنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ সামনের দিক থেকে বরকত আসা। দাহাক বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের অর্থ تَعَظَّمَ সম্মানিত, মহিমান্বিত। খলিল বিন আহমদ বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের অর্থ مَجُدٌ অর্থাৎ গৌরবান্বিত, উচ্চ প্রশংসিত। হোসাইন বিন ফজল বলেছেন–تَبَارَكَ فِىْ ذَاتِهِ অর্থাৎ তিনি আপন সত্ত্বায় বরকতময় وَبَارَكَ مَنْ شَاءَمِنْ خَلْقِهِ এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বরকত দান করেন। বস্তুতঃ تَبَارَكَ শব্দের এ ব্যাখ্যাটি সবচে সুন্দর। ইবনে আতীয়াহ বলেছেন– تَبَارَكَ শব্দের অর্থ হলো عَظَّمَ অর্থাৎ বরকত ও মংগল অধিক পরিমাণে হওয়া। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে تَبَارَكَ শব্দের ব্যবহার জায়েয নেই।

রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মোহাম্মদীকে যে দুরূদ বা সালাত পাঠের কথা বলেছেন সে দুরূদের শেষাংশে রয়েছে–

وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ *

অর্থাৎ, "বরকত ও মংগল নাযিল কর মোহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি বরকত ও মংগলে আপ্লুত করেছিলে ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে।"

কথাগুলো আমাদের নবী এবং তাঁর বংশধরদের মংগল ও বরকতের জন্য বিশেষ দোয়া। ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা যে ধরনের মংগল, কল্যাণ, দয়া ও রহমত নাযিল করেছিলেন সে ধরনের বরকত যেন অধিক পরিমাণে সব সময়ের জন্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের জন্যে নাযিল করেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা কি ধরনের বরকত ও মংগল করেছেন তা ইতিপূর্বে কুরআনের উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা হয়েছে। বরকত নাযিল হওয়ার আরো আয়াত হলো–

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ *

আমি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, তিনি সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। তাঁকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি।

(সাফফাত ঃ ১১২, ১১৩)

আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর আহল সম্পর্কে আরো বলেছেন–

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

আল্লাহর রহমত ও বরকত যা তোমাদের উপর হে গৃহবাসী! নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও মহিমাময়। (হুদ ঃ ৭৩)

সূরায়ে বাকারার ১২৩ আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) নবী প্রেরণের (وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا) যে দোয়া করেছিলেন তারই সর্বশেষ বাস্তবায়ন ছিল নবী আলাইহিস্ সালামের আগমন। ইতিমধ্যে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের বংশধরদের মধ্য থেকে কয়েকজন নবীরূপে আগমন করেছেন। আমরা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য সকল প্রেরিত নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান রাখা, তাঁদের কার্যাবলী ও হুকুম আহকামের স্বীকৃতি দেয়া ঈমানী দায়িত্ব কর্তব্য।

কুরআনের অমোঘ বাণী এবং রাসূলের কথা– হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরগণ পবিত্র, বরকতময় ও কল্যাণকর। বিশ্ব জুড়ে তাদের রয়েছে খ্যাতি, অবদান। যেসব আল্লাহ্ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের দরুণ তাঁরা খ্যাত সেগুলোর পরিসংখ্যান এরূপ–

(১) মহান আল্লাহ এ ঘর থেকেই নবী মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে কিতাব দিয়েছেন। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের আগমনের পর তাঁর বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশ থেকে নবী প্রেরিত হয়নি।

(২) এ ঘর থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা হিদায়াতের ইমামগণকে নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের সৎলোকগণ তাঁদের কাছে ঋণী এ কারণে যে, তাঁরা তাদেরই তরীকা অনুযায়ী চলার কারণে সৎলোক তথা জান্নাতবাসী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

(৩) আল্লাহ্ তায়ালা এ ঘর থেকে দু'জন খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) গ্রহণ করেছেন, একজন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ অপরজন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেন–

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً *

"এবং আল্লাহ্ তায়ালা ইব্রাহীমকে খলিল রূপে গ্রহণ করেছেন"।

(নিসা ঃ ১২৫)

অপরদিকে রাসূল (সঃ) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً *

আল্লাহ্ আমাকে খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন যেমনি ইব্রাহীমকে খলিলরূপে গ্রহণ করেছিলেন।" (মুসলিম ঃ ৫৩২)

(৪) আল্লাহ্ তায়ালা এ ঘরের মালিককে সারাবিশ্বের ইমামরূপে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ - قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا *

"এবং যখন ইব্রাহীমকে কতিপয় ঘটনা দিয়ে তাঁর প্রভু তাকে পরীক্ষা করলেন, তখন তিনি সে পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন। পরন্তু আল্লাহ বললেন– আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্যে ইমাম নিযুক্ত করলাম।" (আহমদ, তিরমিযি)

(৫) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) হাতেই কাবা ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এই কাবা ঘর সারাবিশ্বের মুসলমানের জন্যে কিবলা রূপে পরিগণিত হয় এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ পালনের জন্যে এখানেই আসতে হয়।

(৬) আল্লাহ্ তায়ালা আহলে বাইতের উপর দুরূদ পড়ার যে আদেশ বান্দাদেরকে দিয়েছেন, সেরূপ আদেশ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আহল এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এরূপ নির্দেশ অন্য কোনো নবীর বেলায় দেয়া হয়নি।

(৭) ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের বংশধরদের থেকে দুটি নন্দিত উম্মত বিশ্বখ্যাত ও স্বীকৃত হয়। উম্মতে মুসা এবং উম্মতে মোহাম্মদী। আর উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহ্ তায়ালা ৭০ ধরনের উম্মতের চেয়েও বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। (আহমদ, তিরমিযি)

উম্মতে মোহাম্মদী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মত; মানুষের মংগলের জন্যে তোমাদের আবির্ভাব।"

(৮) আল্লাহ্ তায়ালা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরদেরকে পৃথিবীতে সততা, পরোপকারী ও বদান্যরূপে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আজকের বিশ্বে তাঁর উপর সালাম ও সালাত ও প্রশংসা প্রদর্শন করে তাঁর কথা স্মরণ করা হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *

"আমি তাদের জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্য থেকে দিয়েছি যে, ইব্রাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।" (সাফফাত ঃ ১০৮-১১০)

(৯) আল্লাহ তায়ালা এ ঘরকে লোকদের মধ্যে 'ফুরকান' বা পার্থক্যকারী রূপে নির্ণয় করেছেন। যারা এ ঘর তথা তাঁর অনুসৃত আদর্শ ও নীতিসমূহ অনুসরণ করেছে তাঁরা 'সায়ীদ' বা সত্যানুসারী রূপে পরিগণিত হয়ে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর বিরুদ্ধাচারীগণ 'শাকী' বা হতভাগা রূপে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামের অনলে দগ্ধ হতে থাকবে।

(১০) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নামের সাথে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নামও সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং বলা হয়, ইব্রাহীমু খলিলুল্লাহ্।

(১১) সারা বিশ্বের এটি একটি অনন্য পরিবার। আল্লাহকে চিনা জানা, মান্য করা এবং তাঁর ভয়ে সদা শংকিত থাকা, তাঁর নিয়ামতের আশায় বিনয়ী ও অনুগত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে আর কোনো ঘর পাওয়া যাবে না। সর্ববিদ জ্ঞান ও গুণের এটি একটি খনি।

(১২) আল্লাহ্ পাক এ পরিবারের লোকদের হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। দুনিয়াবাসীর অধিকাংশ লোক তাদেরকে মান্য করে।

(১৩) শত্রুর উপর তারা এমন বিজয় লাভ করেন যা ইতিপূর্বে কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

(১৪) মহান আল্লাহ্ তাঁদের গড়া কীর্তিসমূহ এমনভাবে মর্যাদাবান করেন যে, সেসব কীর্তি অবশিষ্ট থাকার উপর দুনিয়া টিকে থাকা নির্ভর করে। এ পর্যায়ে বলা যায় কাবা, কুরবানী, মিনা তথা হজ্জের কথা। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে .... (রাঃ) বলেছেন–

لَوْتَرَكَ النَّاسُ كُلُّهُمُ الْحَجَّ لَوَقَعَتِ السَّمَاءُ عَلَى الْاَرْضِ *

"অর্থাৎ যদি সমগ্র লোক হজ্জ পরিত্যাগ করে তাহলে আকাশ যমীনের উপর ভেংগে পড়বে।"

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَرْفَعُ اللّٰهُ بَيْتَهٗ مِنَ الْاَرْضِ وَكَلَامَهٗ مِنَ الْمُصْحَفِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ ـ فَلَا يَبْقٰى لَهٗ فِى الْاَرْضِ بَيْتٌ يُحَجُّ وَلَا كَلَامٌ يُتْلٰى، فَحِيْنَئِذٍ يَقْرُبُ خَرَابُ الْعَالَمِ *

"শেষ যমানায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ঘর বাইতুল্লাহ্ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন এবং তাঁর বাণীসমূহ কুরআন এবং মানুষের মন-মগজ থেকে মুছে ফেলবেন। ফলে হজ্জ করার এবং কুরআন তিলাওয়াত করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। তখনই পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া অত্যাসন্ন হয়ে দাঁড়াবে।"

(ইবনে মাজাহ ঃ ৪০৪৯)

এসব হাদীস এ কথার প্রমাণ যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তথা তাঁর বংশধরগণ যে অমর কীর্তি রেখে গেছেন তা সৃষ্টির লয় পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে। আর এগুলো ধ্বংসের সাথে সাথে দুনিয়ার আয়ু শেষ হয়ে যাবে। এরূপ অমর কীর্তি স্থাপন করা অন্য কারো জন্যে সম্ভব হয়নি।

উপরোক্ত অবদান, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে আমাদের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্যে আল্লাহর কাছে বরকত ও মঙ্গল কামনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে কামনা করতে হবে সে কথাও তিনি আমাদেরকে শিখেয়েছেন। তাই আমরা বলি–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের অপর বৈশিষ্ট হলো, তাঁর ও তাঁর বংশধরদের আগমনের কারণে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াবাসীদের অপরাধের শাস্তি প্রদান সাধারণভাবে মুলতবি রাখেন। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের আগমনের আগে মানুষ অপরাধ করলে সাথে সাথেই অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হতো। যেমন নূহ (আঃ) হুদ (আঃ) সালিহ (আঃ) লুত (আঃ) প্রমুখ নবীগণের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ঘটেছিল। এসব সম্প্রদায়ের কাউকে অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বানর জাতীয় পশুতে রূপান্তরিত করা হয়। আবার কাউকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোনো সম্প্রদায়কে অপরাধের দরুন বিলীন ও নিশ্চিহ্ন করা হয়। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশের মনীষীদের আগমণের পর তাৎক্ষণিক শাস্তি রহিত করে অপরাধ ক্ষমা চাওয়ার অবকাশ দেয়া হয়। কেউ যে কোনো ধরনের অপরাধ করলে সে অনুতপ্ত হলে কিংবা আল্লাহ্র কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাইলে দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কেউ নবী-রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে চলতে বাধা দিলে কিংবা নবীগণের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করার অবকাশ রয়েছে। এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিফল হলে সেক্ষেত্রে অপশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতঃ জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করা কিংবা বিজয়ের মালা পড়ে 'গাযী' উপাধি ধারণ করার অবকাশ রয়েছে। শহীদ কিংবা 'গাযী' হওয়ার এরূপ কোনো সুযোগ সেকালে ছিল না।

এসব সংগত কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশধর এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা, তাদের জন্যে দোয়া করা আমাদের নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ষোল ঃ 'হামীদুন' ও 'মাজীদুন' এর তাৎপর্য

'দুরূদ' শরীফের শেষে ব্যবহৃত দু'টি শব্দ حَمِيْدٌ 'হামীদুন' এবং مَجِيْدٌ 'মাজীদুন' এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে এখন আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হলাম।

حَمْدٌ শব্দটি مَحْمُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য গুণবাচক নামের ন্যায় حَمِيْدٌ ও একটি গুণবাচক নাম। فَعِيْلٌ শব্দের ছন্দে অনুসৃত।

যেমন– حَلِيْمٌ - حَكِيْمٌ - قَدِيْرٌ - عَلِيْمٌ - بَصِيْرٌ -

حَمْدٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রশংসা, স্তুতি, স্তব, গুণগান, মহিমা। ব্যাপক অর্থে حَمِيْدٌ বলা হয়ে এমন সত্ত্বাকে যার এমনসব গুণাবলী ও উপাদান আছে যদ্বারা ঐ সত্ত্বার প্রশংসা ও গুণগান করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তিনি স্বতই প্রশংসিত। প্রশংসাকারী সংশ্লিষ্ট যে বস্তু বা সত্ত্বার প্রশংসা করে সেটাই مَحْمُوْدٌ কিংবা প্রশংসিত।

حَمْدٌ শব্দটি প্রশংসা বা স্তুতির পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে এবং শব্দটি প্রশংসিত সত্ত্বার প্রশংসা করা অপরিহার্য করে তোলে। আল্লাহ্‌র শানে শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ পাক পরওয়ারদেগার এমন সত্ত্বা যার মধ্যে প্রশংসা পাওয়ার উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্ তায়ালার সত্ত্বা, তাঁর গুণাবলী, কার্যাবলী, নামাবলীতে প্রশংসা ও স্তুতির পরিপূর্ণ উপাদান রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এগুলোর মধ্যে কেনো ধরনের অপূর্ণতা, খুঁৎ কিংবা ত্রুটি পরিদৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। মানুষ জাতি আল্লাহ্ তায়ালার এই পরিপূর্ণ ও নিরংকুশ প্রশংসার বহিঃপ্রকাশ করে رَحِيْمٌ - حَلِيْمٌ - كَرِيْمٌ - قَدِيْرٌ - عَلِيْمٌ - سَمِيْعٌ - بَصِيْرٌ - ইত্যাকার শব্দ দ্বারা।

مَجْدٌ শব্দ থেকে مَجِيْدٌ শব্দের উৎপত্তি। এ শব্দটিও فَعِيْلٌ এর ছন্দে অনুসৃত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ– মর্যাদা, গৌরব, মহিমা, মহত্ত্ব,

সম্মান। ব্যাপক অর্থে এমন সত্ত্বাকে বুঝায় যার মর্যাদা, গৌরব, মহত্ত্ব অনিবার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত। মানব জাতি আল্লাহ্‌র এই মহত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে (لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ) 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' এ ঘোষণার মাধ্যমে। ঘোষণাটির প্রথম অংশ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কথার প্রমাণ যে, একচ্ছত্র ও নিরংকুশ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালা। তিনি এক ও একক। শেষাংশ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব, সম্মান ও মহিমার প্রকাশ। সুতরাং مَجِيْدٌ শব্দটি আল্লাহ্‌র মহিমা, সম্মান ও গৌরবকে পরিপূর্ণ ও নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানব জাতিকে তাঁর মহিমা ও গুণগান করার ভাষা ও পদ্ধতি শিখিয়েছেন। মহিমা ও স্তবকের ব্যাপারে আল্লাহ্ বললেন–

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

"হে গৃহবাসী! আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত তোমাদের উপর, নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও মহিমাময়।" (হুদ ঃ ৭৩)

তিনি আরো বলেছেন–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا *

"এবং বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার কোনো সন্তান নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর দরকার হতে পারে। সুতরাং আপনি তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করতে থাকুন।" (বনি ইসরাঈল ঃ ১১১)

অপর আয়াতে আছে–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .... وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

"কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" (আর রহমান ঃ ৭৮)

"এবং অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত্বা।" (ঐ ঃ ২৭)

কোরআনের অপর আয়াতে শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ـ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ *

"তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশের অধিপতি।" (বুরুজ ঃ ১৪, ১৫)

রাসূলের বাণী হাদীসে বিপদকালে আল্লাহ তায়ালার মহিমা ও গৌরবের কথা উল্লেখ করে দোয়া করার কথা উল্লেখ আছে। রাসূল বলেছেন– বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে বল–

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ *

দুরূদের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় حَمِيْدٌ এবং مَجِيْدٌ শব্দদ্বয় দিয়ে। শব্দ দু'টি মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, মহিমা ও গৌরব সূচক গুণবাচক নাম। এ গুণবাচক নাম দিয়ে দুরূদের ইতি টানার তাৎপর্য হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ আলাইহিস্ সালামের মান-মর্যাদা, গৌরব, মহিমা বাড়িয়ে দেয়ার আকুতি প্রকাশ করা।

নবী রাসূলগণের মান-ইজ্জত, গৌরব, মহিমা এবং তাঁদের বদান্যতা সততা, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা স্বতসিদ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও বান্দাহ আল্লাহ্র কাছে দুরূদের মাধ্যমে তাঁদের গৌরব ও মান-সম্মান বাড়িয়ে দেয়ার এই যে আকুতি-মিনতি তা একথার বহিঃপ্রকাশ যে, আল্লাহ কোনো দুরূদ পাঠকারীকেও এ অছিলায় ইজ্জত ও সম্মান দান করেন। গৌরব ও মহিমা বাড়িয়ে দেন।

সতের ঃ নবীগণ ব্যতীত অপরের প্রতি দুরূদ পাঠ করা যায় কিনা

একথা অনস্বীকার্য যে, নবী রাসূলগণের উপর দুরূদ ও সালাম (اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) পেশ করতে হবে। নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ، اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ *

(সাফফাত ঃ ৭৮-৮০)

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কিত বাণী হলো–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ *

(ঐ ঃ ১০৮-১০৯)

মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ *

(ঐ ঃ ১১৯-১২০)

ইলয়াস (আঃ) সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

سَلَامٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ *

(ঐ ঃ ১৩০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে নবীগণের নাম উল্লেখ করতঃ তাঁদের উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। অধিকন্তু বলা হয়েছে فِى الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ পরবর্তীতে যারা আসবেন তাদের মধ্যেও সালাম বা শান্তি বর্ষিত হওয়ার ধারা বজায় থাকবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সালাম বর্ষণ করার পর পরবর্তীতে তাদের উপর শান্তি. দয়া, রহমত কামনা করার ধারা অব্যাহত রাখার প্রকৃতি অবশিষ্ট রাখেন। ফলে নূহ , ইব্রাহীম, মুসা, হারুন, ইলইয়াস আলাইহিমুস সালামের পরও দুনিয়াবাসী নবীগণের উপর সালাম পেশ করবেন, তাঁদের স্তুতি গাইবেন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে দুনিয়ার লয় প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ পর্যন্ত।

সকল নবীগণের উপর 'সালাত' বা দুরূদ পাঠের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। শেখ মহীউদ্দীন নববী (রঃ)-সহ প্রায় সকলেই একমত যে, নবীগণের উপর সালাত পাঠ করা ঠিক এবং পড়া দরকার। ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেন– আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো উপর সালাত বা দুরূদ পাঠ না করাই ভালো। তবে তাঁর সাথী শাগরীদগণ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, আমরা সালাতের মাধ্যমে আমাদের নবী ব্যতীত অপর কোনো নবীর আনুগত্য এমনভাবে করবো না যেমনি আমরা আমাদের নবীর উপর সালাত বা দুরূদের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে থাকি।

"আলিন নবী" বা নবী আলাইহিস্ সালামের পরিবার-পরিজনদের উপর দুরূদ পাঠ করা সকলের মতেই বৈধ।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথক করে শুধুমাত্র নবী পরিবারের উপর দুরূদ পাঠ করা যায় কিনা? গবেষকগণ এ জিজ্ঞাসার জবাব দুভাবে দিয়েছেন–

একটি হলো– যদি বলা হয়– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ আল্লাহুমা ছল্লিআলা আলি মোহাম্মাদ" তাহলে এরূপ বলা জায়েয। এরূপ দুরূদ পাঠ করায় রাসূলের উপরও দুরূদ পাঠ করা বুঝায়। কেননা এ বাক্যে শব্দগতভাবে নবী আলাইহিস সালামের পৃথক হওয়া দৃশ্যতঃ পরিদৃষ্ট হলেও অর্থগত দিক থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ না করে পৃথকভাবে তাঁর পরিজনদের উপর 'সালাম' পাঠ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ অনৈক্যমত পোষণ করেছেন। যেমন কেউ বললেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَلِيٍّ *

অথবা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى حُسَيْنٍ *

কিংবা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى فَاطِمَةَ *

এরূপ সালাত পাঠে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ না থাকায় এভাবে 'সালাত' পেশ করাকে ইমাম মালেক (রঃ) মকরূহ বলেছেন। কেননা অতীতে এরূপ পৃথক 'সালাত' পাঠের কোনো নজির

নেই। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), সুফিয়ানে সাওরী এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ প্রমুখও এমত পোষণ করেছেন।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেছেন– ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ يَرْضٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْاِسْتِغْفَارِ *

অর্থাৎ নবী আলাইহিস সালাম ব্যতীত অপর কারো জন্যে 'সালাত' পাঠ করা সঠিক নয়। তবে মুসলমান নর-নারীদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করা উচিত। এ মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)।

এ পর্যায়ে জাফর বিন ফোরকানের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন– ওমর বিন আবদুল আযীয গভর্নরদের কাছে একটি চিঠিতে লিখেন–

اَمَّا بَعْدُ : فَاِنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ اِلْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ - وَاِنَّ الْقَصَاصَ قَدْ اَحْدَثُوْا فِى الصَّلَاةِ عَلٰى خُلَفَائِهِمْ وَاُمَرَائِهِمْ عَدْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاِذَا جَاءَكَ كِتَابِى، فَمُرْهُمْ اَنْ تَكُوْنَ صَلَاتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَدُعَائُهُمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً *

(শুনা যাচ্ছে) কিছু সংখ্যক লোক আখেরাতের করণীয় কার্যক্রমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আবার কতিপয় কাহিনীকার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে আমীর অমাত্য এবং খলিফাদের উপর দুরূদ পাঠ করার রেওয়ায চালু করছে। আমার এ লেখা তোমার কাছে পৌছা মাত্র ঐসব কাহিনীকারদেরকে নির্দেশ দিবে তারা যেনো নবীগণের উপর 'সালাত' পাঠ করেন এবং সর্বসাধারণ মুসলমানগণের জন্যে মাগফিরাত কামনা করেন। (সালাত মর্যাদা ঃ ৬৯)

এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী মতাবলম্বীদের ৩টি রায় দেখা যায়–

(ক) স্বতন্ত্রভাবে 'সালাত' পড়া হারাম।

(খ) এরূপ 'সালাত' পাঠ করা মকরূহে তানযিহী। অনেকেই এমত প্রকাশ করেছেন।

(গ) এরূপ না করা উত্তম। তবে এরূপ করা মকরূহ নয়। এ মত ইমাম নববীর (রঃ)। তবে মকরূহে তানযিহী হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন।

'সালাম' পেশ করার ব্যাপারেও গবেষক আলেমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'সালাম' শব্দের অর্থ যদি 'সালাত' ধরে নেয়া হয় তাহলে এরূপ 'সালাম' শর্তহীনভাবে সকলের জন্যে ব্যবহার করা মাকরূহ। যেমন বলা হলো- فُلَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ অথবা বলা হলো اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ আবু মোহাম্মদ আল জুবাইনীসহ অনেকেই এরূপ বলাকে মাকরূহ বলেছেন। এবং তিনি عَلٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ আলা আলাইহিস্ সালাম বলা নিষিদ্ধ বলেছেন।

'সালাম' শান্তি অর্থে প্রতিটি মুসলমান নর-নারী উপস্থিত-অনুপস্থিত এমনকি মৃত ব্যক্তিকেও পেশ করা কিংবা পৌছানো জায়েয। যেমন বলা হলো بَلِّغْ فُلَانًا مِنِّى السَّلَامَ "অমুককে আমার সালাম পৌছে দিও।" এক্ষেত্রে 'সালাম' পৌছানোর মাধ্যমে একজন মুসলমানকে সম্মান প্রদর্শন করা বুঝায়। পক্ষান্তরে 'সালাত' বা 'দুরূদ' হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্য। যেমন আমরা তাশাহুদে বলে থাকি-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ *

আমাদের একথা শিখানো হয়নি এবং আমরা বলি-

اَلصَّلَاةُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ *

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, রাসূলের নাম উল্লেখ করতঃ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের উপর 'সালাত' পড়া বিধি সম্মত। যেমন বলা হয়ে থাকে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ *

এরূপ 'সালাত' পড়া বৈধ। এরূপ সালাতে রাসূলের সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর আহল, সাহাবী, ফেরেশতা এবং বুযর্গ ও আল্লাহ্ ওয়ালা ব্যক্তিত্ব।

আহলে তাআত (اَهْلِ طَاعَةْ) হলো সার্বিকভাবে আল্লাহর অনুগত ব্যক্তিত্ব। এক্ষেত্রে যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতঃ একটি রুসম বা প্রথা প্রচলন করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এরূপ বলা মাকরূহ হবে। এমনকি এরূপ 'সালাত' পাঠ হারামও হতে পারে। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট বুযর্গ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এরূপ 'সালাত' পাঠ কখনো একটি রুসম প্রচলন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এরূপ রুসম ও রেওয়াজ প্রচলন করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গর্হিত। অধিকন্তু যে ব্যক্তির কাছে যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অধিকতর বুযর্গ, সম্মানিত, বরণীয়, পূজনীয় তাঁর নাম কিংবা গোষ্ঠীর নাম সালাতে সংযোজিত হবে। ফলে স্ব স্ব মনোনীত ও পূজনীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সালাতের অন্তর্গত করার একটি ঘৃণিত ও অবজ্ঞেয় প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে। তখন 'সালাত' এর অবস্থান হবে হীনমন্যতা ও স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য প্রয়াস মাত্র। এমতাবস্থায় এরূপ কর্মতৎপরতাকে হারাম বলা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আগের যুগের রাফেজী খারেজী সম্প্রদায় নিজ নিজ নেতাদেরকে নিয়ে এরূপ টানা হেচড়া করেছে। সমকালীন সময়ের সর্বজন নন্দিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে স্ব স্ব মনোনীত ও পূজনীয় ব্যক্তিকে সে সময়ের কিছুলোক ও গোষ্ঠী এরূপ বিষয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে।

আজকের এ যুগেও কতিপয় লোক ও গোষ্ঠী তরীকত বা ইলমে মারিফাতের ছত্রছায়ায় স্ব স্ব বরণীয় ও মনোনীত ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে এরূপ হীনমন্য ও ঘৃণ্য কাজে তৎপর বলে পরিলক্ষিত হয়। মনোনীত ব্যক্তির নামে দুরূদ বা ওযীফা তৈরি করতঃ বানানো ওযীফার অনুশীলন করে পরম তৃপ্তি সহকারে।

একজন বুযর্গ বা আল্লাহর ওলীরূপে খ্যাত ও স্বীকৃত ব্যক্তির জন্যে সালাতের মাধ্যমে দোয়া করা বিধিসম্মত। এমনকি মৃত ব্যক্তির জন্য ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়া করতেন এভাবে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত করুক) এমনিভাবে আল্লাহর রাসূলের সালাত পেশ করার কথাও হাদীসে উল্লেখ আছে।

মোটকথা, কোনো আহলে তাআতের জন্যে 'সালাত' পেশ করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো ধরনের রেওয়ায বা হীনস্বার্থ চিরতার্থ করা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এরূপ 'সালাত' পাঠ জায়েয। অন্যথায় না জায়েয, এমনকি হারাম।

দুরূদ কি ও কেন ?
দুরূদ পাঠের হাদীস ভিত্তিক পদ্ধতি
মূল
ইমাম ইব্‌নে কাইউম জাওযীয়াহ (রহঃ)
অনুবাদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল আযীয